শিউলি ফোটার পরে

আমজাদ হোসেন

ভোর বেলায় শিউলি ফুলের গন্ধ ভালো তো লাগেই। ছেলেবেলার কথাও মনে পড়ে। তাদের সেই ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের নামটাও ফুলের মতই। ফুলেশ্বরী। সেই সঙ্গে বাবা-মা, ভাই-বোন. বন্ধু-বান্ধব। সবার কথাই মনে পড়ে। মাঝে মাঝেই চারু ভাবে, শিউলি ফুলের নামটার বদলে যদি নতুন করে স্মৃতির ফুল নাম রাখা যেত। খুব মজা হত। হাজার বছরের নামটা কি কখনও বদলানো যায়? যায় না। তবু এই ভাবনাটা প্রায়ই ওর মনে উঁকিঝুঁকি মারে।

চারু নামটা চারুর ডাকনাম। এই নামটা শুধু তার বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনরাই জানে। দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবও এখনও এই নামেই ওকে ডাকে। কিন্তু এই এলাকার কেউই এই নামটা জানে না। তারা জানে, আবিদুর রহমান স্টেশন মাস্টার। সবাই ডাকে শুধু মাস্টার সাহেব বলেই।

এক সময়ে মানে দেশ বিভাগের আগে, এই সিংহজানি জংশন স্টেশনটা খুব নামকরা স্টেশন ছিল। এখান থেকেই একটা লাইন গেছে জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে। এই পথেই যাত্রীরা আগে কলকাতায় যেত দর্শনা হয়ে। মাঝখানে অকুল যমুনা নদী ছিল। ঐ নদী পার হত ফেরীতে। ব্রিটিশ আমলের ফেরী। আর অন্যদিকে আরেকটা রেল লাইন গেছে বাহাদুরাবাদ ঘাট পর্যন্ত। ওখানেও ছিল এমন জল থৈ থৈ কুল-কিনারা দেখা যায় না ব্রহ্মপুত্র। ঐ নদীও ফেরীতে পার হয়ে যেত দিনাজপুরের দিকে। সেই সময় খুব নামডাক ছিল এই সিংহজানি জংশন স্টেশনের।।

এখন আর তেমন হাঁক-ডাক নেই। এখনও জংশন স্টেশনই আছে। বাংলাদেশ হওয়ার পর মানুষ আর এদিক দিয়ে কলকাতায় যায় না। শুধু রাজশাহী আর দিনাজপুরের লোক যাতায়াত করে। ঘাট পর্যন্ত লাইনগুলোর

অবস্থাও ভাল না। খুব নড়বড়ে অবস্থা। এই স্টেশন থেকে ঘাট পর্যন্ত যায় খুব আস্তে আস্তে। এইটুকু রাস্তা যেতে সময় লাগে অনেক। এই জন্যেই রাজশাহী দিনাজপুরের যাত্রীরাও আজকাল ঢাকা থেকে সোজা কোচ সার্ভিসে চলে যায়। তাতে সময়ও লাগে খুব কম। কোনো ফেরীর ঝামেলা নেই। একটানে চলে যায় যে যার ঠিকানায়।

গত এক বছর হল, এখানে স্টেশন মাস্টার হয়ে এসেছে আবিদুর রহমান। বয়স দেখলে মনে হয়, একটু কম বয়সেই স্টেশন মাস্টার হয়েছে। এই স্টেশনে চুল দাড়ি পাকা ছাড়া কোনো স্টেশন মাস্টার দেখেনি কেউ। আবিদুর রহমানকে দেখে, প্রথম প্রথম কেউ বিশ্বাসই করেনি? দাড়ি-গোঁফ শেভ করা এত টকটকে ফর্সা মানুষ কী স্টেশন মাস্টার হতে পারে?

তাও আবার ব্যাচেলর। তখন পর্যন্ত বিয়ে-শাদীই করেনি। বয়স চল্লিশের কিছু উপরে। চাকরিও করছে অনেক বছর যাবত। ভাই-বোনের মধ্যে উনিই বড়। বাবার মৃত্যুর পর, তাকে এই রেলওয়ের চাকরিটা দেয়া হয়েছে। যেহেতু তার বাবাও একজন রেলওয়ের বড় অফিসার ছিলেন। হঠাৎ করেই মারা যান। সেইদিক বিবেচনা করেই চাকরিটা তাকে দেয়া হয়। সহকারী স্টেশন মাস্টার হিসেবে প্রথম নিয়োগপত্র পায়। তারা দুই ভাই দুই বোন। বোন দুটি ছিল ছোট। তারা লেখাপড়া করে বড় হতে বেশ সময় লেগেছে। আবিদুর রহমান মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বোন দুটিকে বিয়ে না দিয়ে সে বিয়ে করবে না।

বোন দুটির বিয়ে হয়ে গেছে। ভাইটি এখন বিদেশে। কানাডায় বসবাস করছে। বড় ভাইয়ের জন্যই, সেও এখনো বিয়ে করেনি।

এতোসব জানার পর, স্থানীয় লোকজনের বিশ্বাস হয়েছে। তবু কেউ কেউ বলেছে, আমাদের বাংলাদেশ তো! কাউকে ধরে-টরেই হয়তো স্টেশন মাস্টারের প্রমোশনটা নিয়েছে। স্টেশন মাস্টার এতো কম বয়সে কেউ কখনও হয় না।

নতুন নতুন কিছুদিন এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা হলেও, তার অমায়িক ব্যবহারে, ঠাণ্ডা মেজাজের কথাবার্তায়, সবাই সন্তুষ্ট। সবাই তাকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে। সম্মান করে।

আগে ছিল মফস্বল টাউন। সাবডিভিশন শহর। এখন হয়েছে জেলা। কোটকাচারী, ডিসির অফিস ছাড়া আর কোনো উন্নতি হয়নি এখানে। লোকসংখ্যা বেশী হয়েছে বলে নতুন নতুন বাড়ী-ঘর হয়েছে অনেক। দু'চারটে মার্কেটও হয়েছে নতুন। আর যা ছিল, সব ঠিক তেমনিই আছে।

এই জামালপুর শহরটা এক সময়ে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। শহরের মূল রাস্তার একপাশে, উত্তর থেকে পূর্বদিক পর্যন্ত অকূল ব্রহ্মপুত্র নদ ছিল। বর্ষাকালে মনে হতো, নদী তো নয়, বিরাট এক সমুদ্র। যার কোনো কূল-কিনারা নেই। বর্ষাকালে এই ব্রহ্মপুত্র নদীর রঙ ছিল ঘোলাটে। আর শীতকালে নদীটা থাকতো স্বচ্ছ কাঁচের মতো। এক হাত নিচের মাছগুলোকেও দেখা যেতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেই নদী আর নেই। মরে গেছে। সেখানে এখন শক্ত বালুচর। ঘন ঘাসে ভর্তি। দিনের পর দিন, মানুষ ওখানে বাড়ী-ঘর বানাচ্ছে। নদটা এখনও আছে। সাত-আট হাত লম্বা ঝিরঝিরে একটা খালের মতো। বর্ষাকালে একটু বড় হয়। কিন্তু আশ্বিন-কার্তিকের মাঝামাঝিতেই আবার ছোট হয়ে যায়। জেলা হওয়ার আগে, এই মফস্বল শহরের রাস্তায়, চৈত্র- বৈশাখ মাসে ভিস্তিওয়ালারা সকাল-বিকাল পানি দিত রাস্তায় রাস্তায়। সন্ধ্যা হলেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে, কাঁঠের সিঁড়িটা লাইটপোস্টে লাগিয়ে, উপরে উঠে লণ্ঠনের মতো বাতিটা জ্বালিয়ে দিতো। এসব ব্রিটিশ আমলের কথা। মাঝে মাঝে স্থানীয় লোকজনের মুখেই এসব কথা এখনও শোনা যায়। তারা বলে তাদের হতাশা থেকে। জেলা হওয়ার পর যে রকম শহরের স্বপ্ন দেখেছিল জামালপুরের জনগণ, সে স্বপ্ন এখনও পূরণ হয়নি বলেই মনে মনে খুব দুঃখ নিয়ে তারা সেই ব্রিটিশ আমলের কথা বলে। তাদের মুখে পুরনো সব কথা শুনে শুনে, পুরনো জামালপুর শহরটা, খুব নামকরা একজন চিত্রশিল্পীর আঁকা, জলছবির মতো মনে হয় বিগত দিনের শরহটাকে। ভালই লাগে। শহরের শুরু এই স্টেশন থেকেই। সোজা উত্তর দিকে গিয়ে আস্তে

আস্তে বাঁক ধরে সোজা পশ্চিমে মেডিকেল হাসপাতালের সামনে গিয়ে শহরটা থেমেছে। স্টেশন থেকে এই মেডিকেল পর্যন্ত শহরটা চার থেকে পাঁচ মাইল দীর্ঘ। একটু কম-বেশী হতে পারে। কিন্তু এখনও এই শহরটাকে এক রাস্তার শহরই মনে হয়। এদিক-সেদিক দিয়ে আরও কিছু নতুন রাস্তা বেরিয়েছে। কিন্তু মূল রাস্তা ঐ একটাই। আবিদুর রহমান প্রথম দুই-একবার রিকশায় উঠে পুরো শহরটাকে দেখেছে। এখন আর শহরে যায় না। রাস্তা জুড়ে শুধু রিকশা আর রিকশা। এর মধ্যে অফিসার এবং পাবলিকের গাড়ীগুলো থেমে থেমে যায়। চতুর্দিকে যানজটের একটা হৈ চৈ লেগেই থাকে। প্রয়োজন হলেও শহরে আর যেতে মন চায় না। তার নিজের কোনো স্টাফকে পাঠিয়ে দেয় জরুরী কাজকর্মগুলো সেরে আসতে। স্টেশনের কাছেই তার স্টাফ কোয়ার্টার। ট্রেন না থাকলে বাসায় চলে যায়। বিশ্রাম নেয়। বই পড়ে।

এদিকের লোকজন খুব সহজ সরল। চুল থেকে পা পর্যন্ত গেঁয়ো গেঁয়ো ভাব। লোকাল ট্রেনগুলোর সময় খুব ঝামেলায় পড়ে স্টেশন মাস্টার। কাছাকাছির স্টেশনগুলো যারা এই শহরে আসে, তরিতরকারী, চাল ধান বিক্রী করতে, তাদের অনেকেই এসে স্টেশন মাস্টারকে ধরে, টিকেটের যা দাম আছে, তার চাইতে কম নিতে। যেমন, টিকেটের দাম যদি হয় পাঁচ টাকা, লোকটা মাস্টার সাহেবকে এসে বলবে,

–মাস্টার সাব, একটু কমাইয়া ন্যান? তিন টেকা দেই?

মাস্টার সাব হেসে হেসে বলে,

–কম হবে না।

লোকটা আরও অনুনয় বিনয় করে বলে,

–আইচ্ছা, চাইর টেকায় দিমু! এতো ভাড়া দিলে তো এই শাক-সবজি, তরিতরকারীর ব্যবসা করতে পারমু না!

মনে হয়, মাস্টার সাহেবকে তারা রেলওয়ের দোকানদার ভাবে। শুধু মাস্টার সাহেব নয়, যারা টিকিট বিক্রী করে, তাদের সঙ্গেও এ রকম কথাবার্তা বলে। এখন লোকাল ট্রেনের সময় স্টেশন মাস্টারের রুমের দরোজা বন্ধ থাকে। মাস্টার সাহেব ভাবে, এ রকম মানুষ এখনও আছে বাংলাদেশে! কতো সরল সহজ এরা, সরকারী আইন-কানুন কিচ্ছু বোঝে না। গোটা বাংলাদেশটাকে চেনে না বোধ হয়। এরা চেনে এদের নিজের গ্রাম আর এই শহর। এত বড় পৃথিবীর এইটুকুই তারা চেনে। এর বাইরে কখনও কোথাও যায়নি। স্টেশন মাস্টার ভাবে, গ্রামনির্ভর বাংলাদেশ তো। এ রকম লোকের সংখ্যা, মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হবে।

শুধু এই জামালপুরে নয়, এ জীবনে বহু জায়গায় চাকরি করেছে, এ রকম লোক সব জায়গাতেই পেয়েছে। এদের মধ্যে ভীষণ খিটখিটে মেজাজের মানুষও আছে। অনুরোধ না রাখলে দারুণভাবে ক্ষেপে যায়, সে রকম লোকও দেখেছে। আটআনা একটাকা কমানোর জন্য মাটির দিকে তাকিয়ে সারাদিন দাঁড়িয়েও থাকে। ট্রেন চলে যায়। তবু সে নড়ে না। এমন মানুষও দেখেছে প্রচুর। স্টেশনে থাকলেই বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ পাওয়া যায় প্রতিদিন। একটা স্টেশন যেন হরেক রকম মানুষ চেনার জায়গা।

সে জন্যেই বোধ হয় স্টেশন মাস্টার যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে কম। মানুষ সম্পর্কে এই বয়সেই প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। কোনো যাত্রী কোনো কারণে তার রুমে ঢুকলেই, সে কথা বলার আগেই মাস্টার সাহেব টের পায় সে কী বলতে এসেছে। যাত্রী কিচ্ছু বলার আগেই মাস্টার সাহেব বলে দেয় সে যা বলতে এসেছিল। অনেক যাত্রীই অবাক হয়ে যায়। থমকে থাকে। আবার অনেকেই জিজ্ঞাসা করার আগেই মাস্টার সাহেব বলে দেন,

–রাতের ট্রেনটা ছাড়বে ঠিক রাত তিনটে। অনেক সময় আধা ঘন্টার মত লেট হয় ফেরীর কারণে।

মাস্টার সাহেব এত বছরের চাকরির জীবনে শুধু যেন মানুষ মুখস্ত করেছে। মানুষ দেখতে দেখতে এখন সে মানুষের চেহারা দেখলেই বলতে পারে, মানুষটা কোন ধরনের। যুবক কী যুবতী, মহিলা কী পুরুষ। বিপদে পড়লে এক রকম। রেগে গেলে আবার আরেক রকম। অভিজ্ঞ জেলেরা যেমন নদীর উপরটা দেখলেই বুঝতে পারে ভেতরটা গভীর না অগভীর। মাস্টার সাহেবও ঐ রকম, মানুষ দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরটাও বুঝতে

পারে কী রকম।

অভিজ্ঞতা বেশী থাকলেই কী বয়স বেশী থাকে? সব সময়ে তা সঠিক নয়। অল্প বয়সেও অনেকেরই অভিজ্ঞতা থাকে বেশী। মাস্টার সাহেবের বয়স চল্লিশ কী বিয়াল্লিশ। তার যে অভিজ্ঞতা, সেই তুলনায় বয়স খুব কম। মানুষকে চেনার মত দু'টি চোখ থাকতে হয়। বুদ্ধিটাকেও কাজে লাগাতে হয় সঙ্গে সঙ্গে। স্মৃতিশক্তিটাও খুব প্রখর না থাকলে, এতোকিছু মনে রাখা কী সম্ভব? এসব নিয়ে নাড়াচাড়াও করতে হয় নিবিড় মনে। তাহলেই অভিজ্ঞতা খুব দ্রুত বাড়ে এবং মনে থাকে বছরের পর বছর।

মাস্টার সাহেবের মনটা আজ খুব ভাল। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই শিউলি ফুলের গাছটাকে দেখেছে। এখনও ফুল ফোটেনি। আগামী দু'চার দিনের মধ্যেই ফুটবে। কাল রাতে, মায়ের হাতের চিঠিটা অন্তত কয়েকবার পড়েছে। মা লিখেছে, আগামী আঠারোই আশ্বিন তোর বিয়ে। এখুনি ছুটির জন্য দরখাস্ত দে। মেয়েটি খুব সুন্দর। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার মত। তোর দুই বোন, মিতু আর ঋতু, তারাই ঠিক করেছে মেয়েটাকে। আশ্বিনের আঠারো তারিখ, মেয়ের বাবা-মা'র মত নিয়েই ঠিক করা হয়েছে। তুই স্টেশন মাস্টার বলে মেয়ের বাবা ও আত্মীয়-স্বজন সবাই খুশি। মিতু আর ঋতু তোর একটা ছবিও দিয়েছে ওদেরকে। তোর ছবি দেখে মেয়ের মা বলেছে, ছেলে তো নয় যেন রাজপুত্তুর। তোর দুই বোনকে আমি বললাম, চারুকে মেয়েটারও একটা ছবি পাঠিয়ে দে। ওরা কী বলল জানিস? ছবি পাঠানোর দরকার নেই। আমাদের পছন্দই পছন্দ। ভাইয়া অনেক দিন আগেই এ কথা আমাদেরকে বলেছে। কানাডায় হারুর কাছে একটা ছবি পাঠিয়েছিলাম। ও কি লিখেছে জানিস, ওয়ান্ডারফুল, ভাইয়ার ভাগ্যটা খুব ভাল। ভাগ্য খুব সুপ্রসন্ন না থাকলে এত সুন্দর মেয়ে পাওয়া অসম্ভব। এই বিয়েতে আসার জন্য আমি খুব চেষ্টা করব। আরও অনেক কিছু লিখেছে মা। পৃষ্ঠা বোঝাই শুধু এই বিয়ের কথাই লিখেছে। কে কেমন আছে। মা'র নিজের শরীরের অবস্থা এখন কী রকম? এসব কিছু লিখেনি। শুধু শেষের লাইনটায় লিখেছে, মেয়েটির নামটা কি জানিস? তুলি। এটা ওর ডাকনাম। আসল নাম আফরিনা চৌধুরী। ওরা দুই ভাই-বোন। ভাইয়ের নাম রঙ। আর বোনের নাম তুলি। রঙ-তুলি।

ভাদ্র মাসের এই অসহ্য গরমে, ভোর বেলাতেও কোন রকম হাওয়া থাকে না। গাছগুলো কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে থাকে চতুর্দিকেই। এ রকম অবস্থা কী বৃষ্টির ভয়ে? হঠাৎ করেই বৃষ্টি নামে। বেশীক্ষণ থাকে না। আবার হঠাৎ করেই চলে যায়। তাও সব জায়গাতে এক সঙ্গে হয় না। এই পাড়ায় বৃষ্টি হচ্ছে, ও-পাড়ায় নেই। আবার ও-পাড়ায় বৃষ্টি হচ্ছে তো এ পাড়ায় থাকে শুকনো। ঝকঝকে রোদে সবাই হেঁটে বেড়াচ্ছে। কাজকর্ম করছে। ভাদ্র মাসের এই বৃষ্টিকে বলে দৌড়াদৌড়ির বৃষ্টি। এখানে কয়েকটা ফোঁটা ফেলেই যেন এক দৌড়ে চলে যায় আরেক জায়গায়। আশ্চর্য এই বৃষ্টির দৌড়াদৌড়ি খেলা দেখে কেউ কেউ বলে, চলেই তো যাবে, যাওয়ার আগে একটু লীলা-খেলা করে যাচ্ছে।

মায়ের হাতের চিঠিটা পড়েই কাজ-কর্মের কথা সব ভুলে গেছে স্টেশন মাস্টার। ভোর বেলা থেকেই আকাশ, বাতাস আর ফুল-পাখি নিয়ে ভাবছে। মা'র মুখেও শুনেছে, এই ভাদ্র মাসের শেষের দিকেই একটানা বৃষ্টি হয় সাতদিন। গ্রামের লোক বলে, ভাদ্র মাসের শেষ ঝাপটা। এই বৃষ্টিতেই নাকি কই মাছ কান দিয়ে হেঁটে হেঁটে রাস্তা পার হয়। এসব পুরনো কথা। আজকাল সময় মতো বৃষ্টিও আসে না। শীতের সময় শীত আসে দেরি করে। কই মাছ আর হাঁটবে কী, খালে বিলে মাছ কী আর আছে আগের মত?

সকাল বেলার গরম চা নিয়ে বাড়ির কাজের লোকটা মাস্টার সাহেবের পেছনে পেছনে হাঁটছে। এ পর্যন্ত একবারও বলেনি,

–স্যার আপনার চা!

হঠাৎ পেছনে ফিরে দেখেই অবাক হয়ে গেল মাস্টার,

–কিরে, চা নিয়ে এইভাবে ঘুরছিস কেন? ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তো!

–তাহলে আবার গরম কইরা আনি।

বলেই খুব দ্রুত সে চলে যায়। এই মুহূর্তেই মাস্টার যদি বলতো,

–তুই কতোদিন যাবত চা বানাচ্ছিস?

ওর নাম ফাটু। এখানকার স্থানীয় লোক। মাস্টারের বাসায় কাজ করে মাস্টার এখানে আসার পর থেকেই। স্থানীয় লোকজনেরাই ‘খুব খাটতে পারবে’ বলে ওকে দিয়েছে।

এখখুনি ফাটু উত্তর দিত,

–স্যার, এই চা বানাতে বানাতেই তো আমার বার বছর গেল।

মাস্টার সাহেব যদি বলে,

–তুই ঐ নারকেল গাছে চড়তে পারবি, ডাব খাব?

সঙ্গে সঙ্গেই ফাটু বলতো,

–স্যার পারমু না ক্য, ঐ গাছে গাছেই ত আমার বার বছর কাটছে।

তারপর মাস্টার যদি বলে,

–ফাটু, আমার জুতা জোড়া পালিশ করতে পারবি?

ফাটু ঐ একই রকম উত্তর দেবে!

–পারমু না ক্যান স্যার, এই জুতা পালিশ করতে করতেই ত আমার বার বছর গেছে।

প্রায় সব কথাতেই ও বার বছরের অভিজ্ঞতার কথা বলবে। একবার মাস্টার সাহেব খুব রেগে বলেছিল,

–তোর বয়স কত?

–ক্যান চব্বিশ। একটু ভুল হইতে পারে। জন্ম-তারিখটা ত বাপ-মাও ঠিকমতো কইতে পারে নাই। চব্বিশ না অইলেও ছাব্বিশ। তার বেশী অইবো না।

মাস্টার এই প্রথম চোখ লাল করে বলেছিল,

–তুই যেভাবে, সব কথাতেই বার বছর বলিস। এসব যোগ দিলে মনে হবে, তোর বয়স দুই শ’ চব্বিশ।

হুট করেই ফাটু বলে,

–স্যার যোগ দিবেন ক্যান? এইটাতো আমার ভাষা! কথায় কথায় বার বছর কই, বোঝানোর জন্যে, কথাটা হইলো এই কাজটাও ভালোভাবেই পারি।

–আমি কী অবুঝ? মেধাহীন? আমার মাথায় কী শুধু গোবর?

মাস্টার বুঝতে পারে, একটু চড়া গলায় কথা বলছে। সে যেই হোক, এভাবে সে কখনও কারো সঙ্গে কথা বলে না। নিজেকে সংযত করে খুব দ্রুত সেখান থেকে অন্য কোথাও চলে যায় মাস্টার।।

ফাটুও থমকে থাকে অনেকক্ষণ। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, কথায় কথায় ‘বার বছর’ কথাটা আর বলবে না। কিন্তু এটা তার অভ্যাস। মুদ্রাদোষ। ও বলতে না চাইলেও মুখ ফসকে বেরিয়ে যাবে।

মাস্টার সাহেব জানে ফাটু খুব ভাল ছেলে। বাজার-হাটে সে-ই যায়। কখনও দরদাম বেশী বলে টাকা-পয়সা এদিক সেদিক করে না। মিথ্যে কথাও কম বলে। এখানকার আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলে, ‘খাটুইয়া ছেলে’

মানে পরিশ্রমী ছেলে। দিন-রাত খুব খাটতে পারে।

কারো মনে সামান্য আঘাত দিলেও মন খারাপ থাকে মাস্টার সাহেবের। স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় নেই। অনেকক্ষণ কোন ট্রেন যাওয়া-আসা করবে না। সেই সময় এমন ফাঁকা স্টেশন পেলে, সারা স্টেশন ঘুরে বেড়ায়। এখন ভোর বেলা। গাছে-গাছে রোদের টুকরো ঝিলমিল করছে। প্লাটফর্মেও খানিকটা জায়গা জুড়ে রোদ পড়েছে। বেলা দশটায় একটা লোকাল ট্রেন আসবে। দশটা বাজতে অনেক দেরি। ফাঁকা স্টেশন। ফাটুকে ধমক দিয়ে সে এখন সারা স্টেশন ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপন মনে।

হঠাৎ দেখে ফাটু আসছে দৌড়াদৌড়ি করে। মাস্টার একবার ভাবে, মা আবার বিয়ের ব্যাপারে কোন টেলিগ্রাম পাঠায়নি তো। কাছে এসে ফাটু হাঁফাতে হাঁফাতে বলে,

–টেকা দ্যন, বাজারে যামু। সকাল সকাল না গেলে এই ব্রক্ষপুত্র নদীর টাটকা মাছ পাওয়া যায় না।

নদী সরে গেলে কি হবে? খাল-বিলের মতো হলেও এখনও কিছু মাছ উঠে বাজারে। ব্রক্ষপুত্র নদীর মাছের স্বাদই আলাদা। রান্নাটা ভাল হলে চিরদিন তা মনে থাকে। টাকা দিতে দিতে প্রতিদিনের মতো আজও বলে,

–ভাল মাছ কিনতে পারবি তো।

সব সময় যেভাবে উত্তর দেয়, সেভাবেই ফাটু বলে,

–এই মাছ কিনতে কিনতেই তো আমার, হঠাৎ থেমে যায়। কথাটা মাস্টার পূরণ করে,

–বার বছর গেল।

এই কথা বলে মাস্টার হো হো করে হেসে উঠে। ফাটুও হাসে, কিন্তু একটু কম। শব্দ নেই, শুধু ঠোঁটজোড়া ফাঁক করে ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে তার হাসি প্রকাশ করে এবং আগের মতোই খুব দ্রুত চলে যায়।

মাস্টার মনে মনে বলে, এদের নিয়ে আমি বেশ আছি। আর একজন আছে কাজের মেয়ে। নাম তার মেন্দী। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। দু'বছর স্বামীর ঘর করার পর তালাক নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আবার বাপ-ভায়ের সংসারে এসেছে। দাঁত একটু উঁচু বলে স্বামী তাকে প্রথম অপছন্দ করতো। বিয়ের আগে একবার দেখতে এসেছিল, তখন নাকি মেন্দী মুখ বুঁজেছিলো। একটা কথারও জবাব দেয়নি। শরীরের রঙও কালো। কিন্তু মাথা বোঝাই লম্বা লম্বা ঘন চুল। দোহারা গড়ন। চোখ দু'টি বেশ বড় বড়। ওরও ভীষণ জেদ। জীবনে আর বিয়ে করবে না। দুনিয়ার সব পুরুষ মানুষকেই সে মনে মনে ঘৃণা করে বোধ হয়। ওর ভাবসাব এ রকমই। ছেলেপুলে হয়নি। বাপ-ভাইয়ের অবস্থা খুব ভালো নয় বলেই ফাটু তাকে জোগাড় করে এনেছে রান্নাবান্নার জন্য। স্টেশনের কাছেই বাড়ী। সারাদিন কাজ করে রাত ন'টা-দশটার দিকে বাড়ি চলে যায়। আবার খুব ভোর বেলায় আসে। ফাটু যেমন ফটফট করে সারাদিনই কথা বলে। মেন্দীর চরিত্রটা ঠিক তার উল্টো। সারাদিন কোনো কথাই বলে না সে। টুকটাক যা বলে, তাও খুব আস্তে আস্তে। বিশেষ প্রয়োজনে মাস্টার সাহেবের কাছে আসতে হলে ঘোমটায় মুখ-চোখ ঢেকে আসে। মাথা নিচু করে থাকে। কোনদিন কি মাস্টার সাহেবের মুখোমুখি তাকিয়েছে? মনে পড়ে না। সব কিছুই ভীষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। সাত আট দিন পর পর তার শুধু একটাই কথা। তাও মাস্টারের কাছে এসে বলে না। ফাটুকে দিয়ে বলায়। তার বুড়ো বাপটার খুব অসুখ। কিছু টাকার দরকার। ওষুধ কিনবে। কী অসুখ? তা মাস্টারও জানতে চায়নি কখনও। মেন্দীও বলেনি। পাঁচ দশ টাকার ওষুধ হলে মাস্টার এমনিতেই দিয়ে দেয় কিন্তু বেশী টাকার হলে তখন বেতন থেকে কাটা যায়।

মেয়েটি দিনরাত কাজ করে, তবু তার কোনো ক্লান্তি নেই। কখনও কোন কাজের বেলায় না করে না। মাস্টার শুনেছিল, এ রকম গ্রামের মেয়েরা খায় বেশী, কিন্তু এই মেন্দী খুবই কম খায়। সে যেভাবে পরিশ্রম করে, সেই তুলনায় তার খাওয়া-দাওয়া অনেক কম। তবে হ্যাঁ, সকাল, দুপুর এবং রাতের যে খাওয়া বাঁচে, সব জমিয়ে রাখে। রাতে বাড়ী ফেরার সময় বুড়ো বাপের জন্য তা নিয়ে যায়। ফাটু আর মেন্দী, দুজনেই তার এই ছোট্ট সংসারটাকে ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে রাখে। মেন্দীর রান্নাবান্নাও খুব ভালো। প্রথম প্রথম ভীষণ ঝাল হতো

তরিতরকারী। কিন্তু মাস্টার সাহেব নিষেধ করার পর, এখন ঠান্ডা তরকারী রাঁধে। সামান্য একটু শুকনো মরিচের মসলা দেয় বটে, তা শুধু তরকারীর রঙটাকে ঠিক রাখার জন্য। বেশীরভাগ ঝাল থাকে কাঁচামরিচের।

দুপুর দেড়টা, বিকেল পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ঢাকার মেলট্রেন যাতায়াত করে। এই সময় মাস্টার সাহেব খুব ব্যস্ত থাকে। যাত্রীরাও গিজগিজ করে প্লাটফর্মে। সন্ধ্যার পর পরই স্টেশন ফাঁকা হয়ে যায়। আবার ট্রেন আসবে রাত দশটার পর। পরপর দুটি আন্তঃনগর ট্রেন। যমুনা আর তিস্তা। এর আগে পর্যন্ত স্টেশনটা প্রায় জনশূন্যই থাকে। কয়েকটা চা পান বিড়ি এবং খাবারের দোকান আছে। এখানে সামান্য কিছু লোক বসে বসে আড্ডা দেয়। চা খায়। একটা বইয়ের দোকানও আছে। সেখানে দৈনিক কাগজগুলোও থাকে। দু'চারজন পড় য়া এখানে বই দেখে। পত্রিকা পড়ে।

এ সময়টায় স্টেশন মাস্টার তার কোয়ার্টারে চলে যায়। বিশ্রাম নেয়। পত্রিকাগুলো দেখে। বই পড়ে।

কিন্তু আজ সে যায়নি। প্লাটফর্মের পশ্চিম মাথায় গিয়ে, আলো-অন্ধকারে একা একাই দাঁড়িয়ে অন্ধকারে ঢাকা দূরের গ্রামগুলোকে দেখছে। তার হঠাৎ মনে পড়েছে, যার সঙ্গে তার বিয়ে হবে, মা সেই মেয়েটার ছবি পাঠালো না কেন? মিতু-ঋতুই বা বারণ করবে কেন? মেয়ের কী কোনো খুঁত আছে, যা তার অপছন্দ হবে। এই ধরনের অনেকগুলো ভাবনা তার মনে উঁকিঝুঁকি মারছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ভিড় করছে। একবার মনে হলো মা'র কাছে চিঠি দিই। ওর একটা ছবি পাঠাক। পর মুহূর্তেই মনে হলো, এটা উচিত হবে না। মা খুব দুঃখ পাবে। মা ভাববে আমার প্রতি কী ছেলের কোনো বিশ্বাস নেই। বাবা মারা যাওয়ার পর, চারু সব সময় চেষ্টা করেছে কোনো ব্যাপারেই মা যেন দুঃখ না পায়। এতোদিন সেভাবেই সে সব সময় মায়ের হাসিমুখ রাখার চেষ্টা করেছে। মা যা কিছুই করছে, চারুর মঙ্গলের জন্যই করছে।

তারপরও মনটা আবার খচখচ করে। সারা জীবনের ব্যাপার। মা'র উচিত ছিল মেয়েটাকে একবার দেখিয়ে দেওয়া। মনে হয় তাড়াতাড়িই সব করেছে। আজ-কালকার দিনে ক'জন মেয়ে না দেখেই বিয়ে করে!

তার নিজের বয়স চল্লিশের উপরে। একচল্লিশ বিয়াল্লিশ। বিয়ের বয়স পার হয়ে এসেছে। এই সময়েইতো কোনো মেয়েকে বিয়ে করার আগে ভালোভাবে দেখে নেয়া উচিত। দু'জনের মধ্যে কথাবার্তারও প্রয়োজন ছিল। মা যদি খুব কম বয়সের মেয়ে ঠিকঠাক করে থাকে, তাহলে তো খুব অসুবিধা হবে চারুর। অল্প বয়সের মেয়েদের মন খুব উড় উড় থাকে। যখন-তখন ঘুরে বেড়াতে চায়। একটুতেই খিলখিল করে হেসে উঠে। সংসারে সহজেই মন বসাতে পারে না। এমন মেয়ে, এই বয়সে চারু সামলাবে কী করে?

দুই

স্টেশন মাস্টারের আটপৌরে বাগানে শিউলি ফুটেছে। ঝাঁক-ঝাঁক শিউলি। ডালে ডালে পাতায় পাতায়।

এই শিউলি ফুলের গন্ধে মানুষ নাকি চিরদিনই তার ফেলে আসা কৈশোর অথবা প্রথম যৌবনের স্মৃতির গন্ধ পায়। সেদিনের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। শিউলি ফুলের গন্ধ পেলেই, ভালোবাসা উতলা হয়। মনের মানুষটাকে খুব নিবিড়ভাবে কাছে পেতে চায়।

খুব ছোট্ট এই শিউলি ফুলের জীবন। সারারাত ফুটে আর খুব সকালেই ঝরে যায়। তার বয়স বলো, আয়ু বলো, ওই একটা মাত্র রাত্রিতেই তার জন্মমৃত্যু। এতো ছোট হলেও কী আনন্দময় তার জীবন। নিজের বুকের গন্ধ ঢেলে ঢেলে রাত্রিটাকে স্বপ্নময় করে রাখে। হাওয়া যেন পাগল হয়ে তার গন্ধ নিয়ে ছোটাছুটি করে সারারাত। সেই গন্ধে ভোরের বাতাসও ভারী হয়ে থাকে। এমনভাবে হাজার হাজার শিউলি ফুল সকাল বেলার সবুজ ঘাসের উপর পড়ে থাকে। মনে হয় সারারাত এই শিউলি তলায় কারা যেন বিয়ের বাসর সাজিয়েছিল।

এখন এই গন্ধময় শিউলি জীবন মাস্টার সাহেবের। কনে বউ নিয়ে এসেছে এই কোয়ার্টারে। সারারাত দু'জন ফিসফাস করে কথা বলে। কনে বউ মাঝে-মধ্যেই খিলখিল করে হেসে উঠে। মাস্টার সাহেবও হাসে। কনে বউয়ের সাজানো খোঁপার বাঁধন দুষ্টুমি করে এলোমেলো করে দেয়। ঘন কালো মেঘলা বরণ চুলগুলো ঝর্ণার

মতো তখন খুলে খুলে পিঠের উপর পড়তে থাকে। কনে বউ খুব খুশীতে মাস্টারের গাল টেনে ধরে। জায়গাটুকু হাতের মোচড়ে লাল হয়ে যায়। আবার ওই জায়গাটুকুতে আদর করে চুমো দেয় কনে বউ। সারারাত দুজনার কতো কথা। ঝাঁক-ঝাঁক কথা। মিষ্টি-মিষ্টি কথা। কথায় কথায় কনে বউয়ের ডাগর চোখের দুষ্টুমি। দুজনেরই মনে হয়, রাত এতো ছোট কেন? অনেক দীর্ঘ হলে আরও মজা করা যেতো।

এই অবস্থাতেও রাত সাড়ে তিনটেয় স্টেশনে আসতে হয় মাস্টার সাহেবকে। নর্থ বেঙ্গল থেকে একটা মেলট্রেন আসে এই জংশনে। আটটা, সাড়ে আটটায় ঢাকায় পৌঁছাবে এই ট্রেনটা। এই ট্রেনে ভিড় একটু বেশী থাকে। ট্রেন চলে যাওয়ার পর মাস্টার সাহেব যখন কোয়ার্টারে ফেরে, কনে বউ তখন অভিমান করে গাল ফুলিয়ে বসে থাকে। কখনও আবার গভীর ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকে বিছানায়। মাস্টার তার অভিমান ভাঙ্গায়। শুরু হয় খিলখিল হাসি। ঝাপটা-ঝাপটি। দু'হাতে চুড়ি বাজে। আবার শুরু হয় কথা আর কথা। বুক ভরা কথা। এ কথা কখনও ফুরাবে না। বুকের ভেতর থেকে বের করে আনা কতো সপ্নময় কথা। কনে বউকে বুকে নিয়ে কথা বলতে বলতেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্ত মাস্টার।

মাস্টার ঘুমিয়েই থাকে। কনে বউ খুব ভোরে দরোজা খুলে বাইরে আসে। আটপৌরে বাগানের শিউলি তলায় যায়। আঁচল ভরে শিউলি কুড়িয়ে আনে। তারপরই শুরু হয় তার শিউলি শিউলি খেলা। ঘুমন্ত মাস্টারের মুখে শিউলি ফুলের ঢিল ছুড়তে থাকে। তবু যখন ঘুম ভাঙ্গে না, তখন শিউলি ফুলের ডাঁটা চটকালেই কমলা রঙের রস বেরোয়। আর সেই কমলা রঙ দিয়ে মাস্টারের মুখে হিজিবিজি ছবি আঁকে। কখনও তার নাম লেখে চারু। আবার কখনও নিজের নামটাই লিখে তুলি। আবার কখনও ফুল-পাখির উলটো-পালটা ছবি আঁকতে থাকে। এই নরম নরম আঁকা-আঁকির শিরশিরানিতে মাস্টারের ঘুম ভেঙে যায়। মাস্টার চোখ খুলতেই কনে বউ তার মুখের সামনে চট করে আয়না ধরে। আয়নাতে নিজের মুখে রঙের এতো কাটাকুটি দেখে দুষ্টুচোখে কনে বউয়ের দিকে তাকায়। কনে বউ তখন খিলখিল করে হাসতে হাসতে তার উপরেই লুটোপুটি খায়।

মায়ের চিঠি অনুযায়ীই আশ্বিন মাসের আঠারো তারিখেই বিয়ে হয়েছে। বিয়ের মাত্র তিন দিন আগে ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। তখন চারুর মুখের বিষণ্নতা দেখেই মা চমকে উঠেছিল,

–কিরে চারু, তোর অসুখ নাকি?

চারু খুব রসকষহীন কাষ্ঠগলায় উত্তর দিয়েছিল,

–নাহ, দুদিন পরেই তো বিয়ে, শরীরটাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে তো?

মা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতই দাঁড়িয়েছিলো ছেলের মুখোমুখি। মা শুধু মনে মনে নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করছিলো বারবার, চারু কী এই বিয়েতে অসন্তুষ্ট? নির্বিকার মাকে দেখে, একটু ভয়েই যেন চারু আবার বলেছিল,

–না মা, আমার কোনো অসুখ হয়নি। আমি ভালোই ছিলাম।

তবু মায়ের মন থেকে দ্বিধা যায় না। চারুতো কখনও এভাবে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। মা ভাবে, আরও দু'চারটে দিন আগে আসতে পারতো। আসলো না কেন? যে কোনো সময় চারু বাড়ি গেলে মায়ের ব্যস্ততা বেড়ে যেতো। একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকতো, কেমন ছিলি? এতো দেরি করে চিঠির উত্তর দিস কেন? যে রাঁধে, ঐ মেয়েটা কী ভালোভাবে রাঁধতে পারে? তুই খেতে পারিস? এ রকম হাজার প্রশ্ন। অথচ মা এখন খুব স্তব্ধ হয়ে আছে? দুদিন পরেই বিয়ে? মা'র তো হাজার হাজার প্রশ্ন করার কথা। কি খাবে, না খাবে, সে-সব জিজ্ঞাসা না করে মা হঠাৎ এতো নির্বাক হয়ে গেলো কেন?

চারু নিজেও বুঝতে পারছে, বাড়িতে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই মা যে প্রথম প্রশ্নটা করেছিলো, আসলেই সে খুব রুক্ষভাবে তার উত্তর দিয়েছে, এটা তার উচিত হয়নি। মানুষের মনে যদি কোনো ক্ষোভ থাকে, কখনও সে তা চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। যে কোনো মুহূর্তে সেই ক্ষোভ প্রকাশ পায়।

একটা ক্ষোভ তো চারুর মনে ছিলই। বিয়ে করবে সে, মেয়ে না দেখাক, অন্তত মেয়ের একটা ছবি তো তার কাছে পাঠাবে? কানাডায় তার ছোট ভাইয়ের কাছে ছবি পাঠানো হলো, অথচ যাকে নিয়ে তাকে সারা জীবন থাকতে হবে, তার কাছে কেউ কোনো ছবি পাঠালো না। এই ক্ষোভটা তার মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছিলো।

এমনিতেই তো একটু বেশী বয়সে বিয়ে করছে। এই বয়সটার মধ্যে উচ্ছ্বাস উচ্ছলতা খুব কম। একটু গম্ভীর এবং ভারী বয়স। চাকরিটাও খুব দায়িত্বশীল চাকরি। জংশন স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। মা যদি ছেলের এসব দিক বিবেচনা না করে খুব অল্প বয়সের মেয়ে ঠিক করে থাকে, তাহলে খুব কষ্ট হবে চারুর। সংসার টানতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাবে। এইসব কারণেও মেয়ের একটা ছবি চারুর কাছে পাঠানো খুবই প্রয়োজন ছিল।

দিন রাত এসব ভেবে ভেবেই, চারুর মুখের উজ্জ্বলতা কমে গিয়েছিল। কেমন যেন একটা বিষণ্ণতা জমে উঠেছিলো চারুর চোখে-মুখে। এ বিয়ে হবে না, এমন কথাও মাকে কোনোদিন বলতে পারবে না চারু। এই বিয়ে নিয়ে নানা রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে ভুগতে চারুর মেজাজটাও বিগড়ে গিয়েছিল। যে কোনো মানুষ, যদি তার মনের কথা কাউকে বলতে না পারে, সে এক দম আটকানো অবস্থায় সে চলাফেরা করে। বেঁচে থাকতে হয় বলে বাঁচে। ভীষণ এক হতাশার মধ্যে তার দিনগুলো চলে যায়। না বলতে পারা কথাগুলো জমতে থাকে হৃদয়ের ভেতরেই। কোনো রকম অসুখ না থাকলেও মানুষটাকে তখন দারুণ অসুস্থ মনে হয়। চারুর অবস্থাও এ রকমই। ছুটি সে আরও আগেই নিতে পারতো। শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে হবে বলেই বিয়ে করতে যাচ্ছে। এ রকম মেজাজ নিয়ে যখুনি সে বাড়ির মাটিতে পা ফেলেছে, ঠিক তখুনি মায়ের অই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এ ক'দিনের সমস্ত ক্ষোভ একসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। যার জন্যে মা এখনও থমকে আছে। কারোর সঙ্গে কোনো কথা বলছে না। চারু কি খাবে না খাবে তাও সে ভুলে গেছে। বিয়ে বাড়িতে কতো কাজ। যে যার কাজে এখনও সবাই ব্যস্ত। কেউ বুঝতেই পারেনি মা-ছেলের ভেতরে এই মুহূর্তে কি হয়ে গেলো।

পায়ে জুতো নিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়েছে চারু। বুঝতে পারছে, জীবনে এই প্রথম মা'র সঙ্গে সে দুর্ব্যবহার করেছে। দু'দিন পরেই বিয়ে, এই সময়ে মায়ের মনে আঘাত দেয়া খুব অন্যায়। নিজেই নিজের ভুলের আগুনে পুড়ছে। মাপ চাইতে গেলেও মা যদি বলে, ছেলেরা বিয়ের কথা শুনলেই কী বদলে যায়? মাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। আজ বাদে কাল তার বিয়ে। বিয়ের আগেই যদি এরকম ব্যবহার করে, বিয়ের পরে তো কথাই বলা যাবে না তার সঙ্গে? তখন? তখন কী জবাব দেবে চারু। গনগনে দ্বিধাদ্বন্দ্বের আগুনে পুড়ছে চারুর মন।

তখন থেকেই মা থ' হয়ে আছে। আবার কী বলতে গেলে কী বলবে। আবারো যদি দুর্ব্যবহার করে? এই ভয়েই মা আর চারুর কাছে যাচ্ছে না। মা যেন এক অকুল সাগরে পড়ে গেছে। কোনোদিকে কোনো কুল-কিনারা পাচ্ছে না। তার মনে শুধু একটাই প্রশ্ন, আমার চারুতো এরকম ছিল না। ওর বাবা মরে যাওয়ার পর, নিজের কাঁধে ভাঙা সংসারটা নিয়ে, টেনেটুনে আজ এখানে এনে দাঁড় করিয়েছে। প্রচণ্ড অভাব যখন, তখনও মা'র সঙ্গে সে হেসে হেসে কথা বলেছে। ভাই-বোনদের উপর কোনোদিন কোনো ব্যাপারেই রাগ করেনি। টাকা-পয়সার টানাটুনিতো ছিলই, দুই বোন ঋতু আর মিতুকে খুব কষ্ট করে বিয়ে দিয়েছে। ধার-দেনা করেছে। তবু তো চারু কখনও মেজাজ খারাপ করেনি। আজ হঠাৎ এরকম ব্যবহার করলো কেন? এ প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না মা।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। আশ্বিনের ঝকঝকে নীল আকাশ। মাঝে মাঝে ধবধবে টুকরো টুকরো সাদা মেঘ। রৌদ্রের মধ্যে এখনও ভাদ্র মাসের ভ্যাপসা গরমের আঁচ আছে। বাতাস নেই বলে গাছপালাও নড়ছে না। স্তব্ধ চতুর্দিক। ভাবতে ভাবতে, ভীষণ ক্লান্তিতে জুতো পায়েই ঘুমিয়ে পড়েছে চারু। মা খুব নীরবে চারুর কাছে এসে নয়ন ভরে আবার চারুকে দেখলো। কোনো রকম শব্দ না করে পায়ের জুতো খুলে দিলো। বিকেল বেলা পর্যন্ত মা-ছেলের কোনো কথা হলো না। ঘুম থেকে উঠেই অবেলায় গোসল করলো চারু। যখন সে মাথার চুল আঁচড়াচ্ছে, মা তখন গরম ভাত নিয়ে বসে আছে চারুর জন্য।

চারু খুব ক্ষুধার্ত ছিল। কোনোদিকে না তাকিয়েই হুপহাপ করে খেয়ে নিলো খুব দ্রুত। মা তার কাছেই। তবু

কিছু বললো না মাকে। অথচ মা-ছেলের যতো কথা, এই খাবার সময়েই তার অর্ধেক কথা বলা হয়ে যেতো। কিন্তু আজ একটা কথাও হলো না। যখন যা দরকার মা এগিয়ে দিলো। সেইভাবেই খেয়ে নিলো চারু। ভালো-মন্দ কিচ্ছু না বলেই খাবার শেষ করে চলে গেলো চারু। মা শুধু তার যাওয়ার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

খেতে খেতে চারু অনেকবার ভেবেছে, মাকে বলি, উত্তরটা অইভাবে দেয়া আমার উচিত হয়নি মা। অনেক দূর থেকে এসেছি তো। মেজাজটা ঠিক ছিল না। সরি মা, ক্ষমা করে দিও। কিন্তু বলার মতো সাহসই পেলো না চারু। মা যদি উত্তরটা খুব বাঁকা করে দেয়। বউ পেলেই ছেলেরা মাকে ভুলে যায়। দু'দিন পরেই তো তোর ঘরের বউ আসবে? আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে লাভ কী? সারাদিনই তো বউয়ের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এইসব কথার ভয়েই কিছু বলতে পারলো না চারু।

মা একবার বলতে চেয়েছিল, কোনো তরকারী ভালো না হলে রাগে ভাত-মাছ থালাতে রেখেই চলে যাস। দু'দিন পরে বউ আসবে। নতুন বউ। তার হাতের রান্না যদি খারাপ হয়, তখন কী করবি? এইভাবে ভাত ফেলে চলে যেতে পারবি, নাকি মুখ বুঁজে ওসবই খাবি?

মা আবার নিজেই মনে করেছে, এখন এসব কথা বলা ঠিক হবে না। আরও হয়তো রেগে যেতে পারে। দু'দিন বাদেই যে ছেলের বিয়ে, তার চোখে-মুখে, চলাফেরায়, ভীষণ রকমের একটা আনন্দ কখনও হৈচৈ করে ওঠে। কখনও লাফায়। আবার কখনও লজ্জায় রাঙা হয়ে যায়। সেই আনন্দের বিন্দুমাত্রও তো চারুর চোখে-মুখে নেই। কেমন যেন একটা বিষণ্নতায় তার চোখ-মুখ মলিন হয়ে আছে। সামান্য একটু হাসি-লজ্জা তো নেই-ই, এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলছে না চারু। আসলে বিয়েটা কী হবে? সময়মতো চারু আবার বেঁকে বসবে নাতো? একটা অজানা ভয়ে মায়ের বুকটা ঢিবঢিব করে কাঁপতে থাকে। কোথাও কী কোনো ভুল হয়েছে তার। তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজি করেও মা তার নিজের কোনো রকম ভুল ধরতে পারছে না।

আবার সে নিজে নিজেই ভাবে, ভুল তো কোথাও একটা নিশ্চয়ই হয়েছে। চারুও এমন ছেলে নয়। মা'র সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে। কথা বলবে না। বাড়িতে এসেও চুপচাপ থাকবে। বাইরে বেরোবে না। এতোদিন পর নিজের গ্রামটাকে দেখবে না, এমন ছেলে তো চারু নয়। অনেক দিন ছুটির পর, বাড়িতে এসেই মাকে জড়িয়ে ধরবে। সারা বাড়িতে হৈচৈ করবে। নদীতে সাঁতার কাটবে। গ্রামের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারবে বটতলায়। অথবা বাজারের রূপা মিয়ার চায়ের দোকানে। তার সেই চারু আজ এতো স্তব্ধ কেন? বিয়েটা কী তার মনমতো হচ্ছে না। আমি কী জোর করে ওকে বিয়ে করাচ্ছি? এই জন্যেই ওর মন এতো খারাপ। এতো বিষণ্ন! এই কারণেই কী চারু আমার সঙ্গে কোনো কথা বলছে না?

আজকের দিনটা খুব পরিষ্কার ছিল। শেষ বিকেলের টুকরো টুকরো রোদগুলো যেন অসংখ্য রুমালের মতো 'উঁচু উঁচু' গাছগুলোর মাথায় ছোট ছোট বাতাসে উড়ছিলো। তার একটু পরেই, গোধূলির রঙটাও খুব টকটকে লাল দেখাচ্ছিলো। তেপান্তরের মাঠের মতো সবুজ ধানক্ষেত পেরিয়ে, ছবির মতো দূরের গ্রামের পেছনে, সূর্যটা যখন ডুবছিলো, তখন মনে হচ্ছিলো, সবুজ মেয়ের কপালে যেন লাল টকটকে একটা টিপ জ্বলজ্বল করছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই, ছেলে-পুলে নিয়ে ঋতু আর মিতু ঢুকলো বাড়িতে। খিলখিল করে হাসতে হাসতে হৈ চৈ করে।

ওদের হাসাহাসিতে স্তব্ধ বাড়িটা যেন নেচে উঠলো বিয়ের আনন্দে। মিতু আর ঋতু ভাইয়াকে টেনে তুললো বিছানা থেকে। বড় মামা, বড় মামা বলে চারুকে জড়িয়ে ধরলো তিন-চারটে ছেলেমেয়ে। বড় মামার মুখ থেকে বিষণ্নতা কোথায় যেন হারিয়ে গেলো। ছেলেমেয়েগুলোকে আদর করে করে চুমু খেলো চারু।

সন্ধ্যা হতে না হতেই, আলোয় ভরে গেলো সারা বাড়ি। নানী নানী বলে ছেলেমেয়েগুলো ঝাঁপিয়ে পড়লো নানীর কোলে। কে আগে নানীর কোলে বসবে, এই নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে গেলো ওদের মধ্যে। মা আর চুপ থাকতে পারলো না। নাতি-নাতনীদের নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে গেলো। কে রাগ করেছে, তার রাগ ভাঙালো। শুরু হলো কথা আর কথা। ছেলেপুলেরা যেমন অনর্গল কথা বলছে নানীর সঙ্গে, নানীকেও তার উত্তর দিতে হচ্ছে

হেসে হেসে। আদর করে করে। আদরের চুমো দিয়ে দিয়ে।

এদিকে হঠাৎ করেই চারুকে প্রশ্ন করলো মিতু,

–ভাইয়া তোমার নাকি মন খারাপ?

চারু উত্তর দেবার আগেই ঋতু বলছে,

–অবশ্যই মন খারাপ থাকবে। ভাইয়া যাকে বিয়ে করবে, যে আমাদের ভাবী হবে, সে কালো না ফর্সা? বেটে না লম্বা? এসব না জানলে কী মন ভালো থাকবে? মেয়ে না দেখেই বিয়ে করবে?

–দ্যাখ ঋতু, তুই কিন্তু বাড়াবাড়ি করছিস?

সব দোষ তোর? আমি বললাম, ছবিটা ভাইয়ার কাছে পাঠিয়ে দিই, আর তুই কী বলেছিলি, বল বল,

–আমি বলেছিলাম, ভাইয়া একটু টেনশনে থাকুক। তারপর তুই কী বলেছিলি?

–রাইট, ছবি পাঠাবো না। দেখি আমাদের উপর ভাইয়া বিশ্বাস করে রাজী হয় কিনা।

–হয়েছে তো, ভাইয়াকে আর টেনশনে রাখিস না, ছবিটা বের করে ভাইয়াকে দে, ভাইয়া দেখুক!

–দিচ্ছি বাবা দিচ্ছি, এখখুনি দিচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছবিটা পেলো চারু। ছবিটা প্রথম দেখেই চারুর মনে হলো, এতো সুন্দর মেয়ে কী আমার ভাগ্যে ছিল? বড় বড় পদ্মকাটা চোখ। মাথা বোঝাই ঘন চুল। ছিপছিপে দোহারা গড়ন। জোছনা রঙের টিকোলো নাক। লক্ষ্মীর মতো কপাল। দু'তিন দিনের বাঁকা চাঁদের মতো ঠোঁট। মনে মনে চারু বলে, আমি কী স্বপ্ন দেখছি? নাকি সত্যিই এতো সুন্দরী মেয়ে আমার বউ হবে? আমার ভাগ্য কী এতোই সুপ্রসন্ন। একটু বেশী বয়সে এরকম রূপসী কী ভাগ্যে জোটে?

সারারাত ঘুমুতে পারলো না চারু। ছবিতেই এ রকম? বাস্তবে না জানি আরও কতো সুন্দর। রাতে একবার ছবিটার দিকে তাকিয়ে, গুনগুন করে দু'লাইন গানও গেয়েছিলো চারু–

'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি

সে কি মোর অপরাধ।'

চিরদিনই চারুর মনটা খুব খুঁতখুঁতে। হঠাৎ মনে হলো, আমার বয়স যে একটু বেশী, এই মেয়ে কী তা জানে? জেনে-শুনেই কী একটু বেশী বয়সের মানুষকে বিয়ে করবে বলে রাজী হয়েছে? তবু বিশ্বাস হয় না চারুর। আর যদি রাজী হয়েই থাকে, তাহলে মেয়েটার নিশ্চয়ই কোনো খুঁত আছে। তাহলে এমন মেয়ের বিয়ে তো অনেক আগেই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল? মিতু যা বললো, তার সবই ঠিক? নাকি মেয়ে পক্ষ কিছু গোপন করেছে। বিয়ের সময়তো অনেকেই অনেক কিছু গোপন রাখে।

আবার একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়লো চারু। মিতু বলেছে, মেয়েটা স্থানীয় একটি প্রাইমারী স্কুলে চাকরি করে। বাংলা পড়ায়। ওর বয়স এখন ছাব্বিশ-সাতাশ। বিয়ের প্রস্তাব এসেছে অনেক। সবই ভালো ভালো সচ্ছল সংসারের প্রস্তাব। কিন্তু মেয়েটি রাজী হয়নি? কেন? সে কি কাউকে ভালোবাসতো? কাউকে যদি ভালোই বাসে, তাহলে চারুর প্রস্তাব পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হওয়ার তো কথা নয়? এতোদিন রাজী হলো না অথচ আমাকে না দেখেই রাজী হয়ে গেলো? কেন?

আবার এ কথাটাও মনে পড়ে চারুর। বিয়ে-শাদীর ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। কেউ শত চেষ্টা করেও ভালো মেয়ে পায় না আবার কেউ চেষ্টা না করেই সতী-লক্ষ্মী ভাগ্যবতী মেয়ে পায়। কার ভাগ্যে

কি আছে, তা নাকি এই কপালেই লেখা থাকে।

নিজের মনের যতো দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর ভাগ্য, এসব নিয়ে সারারাত মনে মনে লড়াই করে। অবশেষে ভাগ্যের কাছেই হার মানে চারু। সারারাত আর ঘুমুতে পারে না। হঠাৎ মনে হয়, সামনেই বিয়ে। মেয়ে খুব সুন্দরী। অপরূপা। অতুলনীয়া। আমার ঘুম না হলে যদি চেহারা খারাপ হয়ে যায়? তখন কী তার পাশে আমাকে মানাবে? এমনিতেই তো আমার বয়স একটু বেশী?

বাইরে, ভোরের রোদ উঁকিঝুঁকি মারছে। কিচির-মিচির শুরু হয়ে গেছে পাখিদের। ঘুম থেকে ওঠা মানুষের কলরব ক্রমাগত বাড়ছে। তবু চাদরে মুখ ঢেকে ঘুমোবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে চারু।

এই আশ্বিন মাসের ভোর বেলাতেই, দল বেঁধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে আকাশে। উড়তে উড়তে বিন্দু বিন্দু হয়ে যায়। শিউলি ফুটে, হাজার হাজার শিউলি পড়ে থাকে শিউলি তলার সবুজ ঘাসে। নদীর পাড়ে পাড়ে কাশফুল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়; কিন্তু দখিনা বাতাসের ভারে একটু নত হয়ে যায়। বাঁক ধরে শরীরে। রোদে রোদে ভেসে যাচ্ছে দশদিক। তবু ঘুমোবার চেষ্টা করছে চারু। কিছুতেই ঘুম আসছে না। তবু তাকে ঘুমুতেই হবে, এরকম একটা প্রতীক্ষা করে যেন এখনও শুয়ে আছে চাদরে মুখ ঢেকে।

বিয়ে হয়ে গেলো আশ্বিন মাসের আঠারো তারিখেই, দিনের বেলাতেই। এখনও কোনো কোনো রাস্ত-ঘাটে জল-কাদা জমে আছে। এদিকে সন্ত্রাসীদের উপদ্রব ইদানীং একটু বেশী। পর পর কয়েকটা বিয়ে বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। এসব কারণেই, বিয়েটা দিনদুপুরেই শেষ করে ফেলবে বলে আগে থেকেই মুরুব্বীদের প্রস্তুতি ছিল। সেইভাবেই দিনদুপুরে বিয়ে শেষ হয়ে গেলো। খাওয়া-দাওয়া। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে পরিচয়। সব শেষ করে দিন থাকতেই কনে নিয়ে চলে এলো চারু। কান্নাকাটিতো হবেই। এতো আদরের মেয়ে চলে যাচ্ছে নিজের বাড়ি-ঘর ছেড়ে। মায়ের কান্নাতো থামানো যায় না। বুক ভেঙে যে কান্না বেরিয়ে আসে, তা কি সহজেই থামে? মাকে অই অবস্থাতেই রেখে বরের সঙ্গে চলে আসতে হলো কনেকে। এটাই নিয়ম। হাজার বছর ধরে, এভাবেই মেয়েরা চলে আসে।

এতো সুন্দর বউ পেয়ে চারুর মায়ের খুশী যেন উপচে পড়ছে। বাবা মারা যাওয়ার পরে যেন এই প্রথম বুকভরা খুশী নিয়ে হাসতে হাসতে চারুকে জিজ্ঞাসা করলো,

–কি রে চারু, বউ পছন্দ হয়েছে?

লজ্জায় চারুর মুখ লাল হয়ে যায়। কোনো কথা বলতে পারে না। মুচকি হাসতে হাসতে মাথা নীচু করে মা'র সামনে থেকে একটু দূরে চলে যায়। মা বোঝে, এ কথায় চারু ভীষণ লজ্জা পেয়েছে।

চারু ভীষণ লাজুক ছেলে। প্রথম রাতে কিচ্ছু বলতে পারলো না তুলিকে। তুলি খুব চালাক চতুর মেয়ে। মনে মনে তার প্রস্তুতি ছিল, চারু কিছু বললেই মাথা নীচু করে তার উত্তর দেবে। চারু যদি কাছে না আসে, সে নিজে চারুর কাছে যাবে না। প্রহরের পর প্রহর যাচ্ছে, তবু চারু কোনো কথা বলতে পারছে না। কোন কথাটা প্রথম জিজ্ঞেস করবে, মনে মনে তার ভাষা খুঁজতে খুঁজতেই ভোর হয়ে গেলো। কী চালাক মেয়ে তুলি, নিজের তরফ থেকেও কিছু বললো না। দু'চারবার বাঁকা চোখে দেখেছে চারুকে। এই রাতে চারু যে খুব নার্ভাস, তা টের পেয়েছে তুলি। মনে মনে রাগ করেনি কিন্তু এমন সহজ সরল বর পেয়ে খুব খুশী হয়েছে তুলি। জীবনে এই রকম একটা বর পাবে, এ রকম একটা আশা ছিল তার। তুলির চোখের ভাষা দেখলেই, এই কথাটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

ভোর বেলায়, এখনও বাড়ির কেউ ঘুম থেকে উঠেনি। ঠিক সেই সময় যেন অনেক সাহস সঞ্চয় করে চারু বললো,

–কাল থেকে আমার ছুটি শেষ!

চারু ভেবেছিলো, এই কথাটার কোনো একটা উত্তর আসবে তুলির মুখ থেকে, কিন্তু তুলি রইলো নিশ্চুপ।

আগের মতই মাথা নীচু করে বসে আছে। হাতে-পায়ে আলতা মেহেদীর নকশা। গা-ভর্তি গয়না। কপাল জুড়ে কুমকুমের আলপনা। আরও অপরূপা লাগছে তুলিকে। কথা বলছে না বলে তার এই নীরবতা আরও ভালো লাগছে চারুর। এবারও চারুই বললো,

–আমার সঙ্গেই তোমাকে যেতে হবে।

এবারও কথার কোনো উত্তর দিলো না তুলি।

আজ ক'দিন হলো?

চারুর বুকে মাথা রেখে তুলি বললো,

–সাতদিন!

–এই স্টেশন কোয়ার্টারে তোমার কেমন লাগছে।

–তুমি সঙ্গে থাকলেই সব ভালো লাগে!

–আমি যখন ডিউটিতে থাকি!

–খারাপ লাগে। কিন্তু আমারও তো ডিউটি আছে সাহেব, এই ছোট্ট সংসারের কাজকর্ম কী কম? তোমার ফাটু ...

এই বলেই খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠে তুলি। এই হাসি সহজে থামানো যায় না। এমনিতেই তো অদ্ভুত একটা নাম- ফাটু, এই নাম শুনলেই তো হাসি আসে। তারপর ও যা কথা বলে, কথায় কথায় বারো বছর। আর কিচ্ছু বলতে পারে না তুলি। হাসতে হাসতে পেটে খিল্‌ লাগে। অনেকক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে তুলি বলে,

–তবু, তোমার ফাটু খুব ভালো। সৎ মানুষ। মোষের মত পরিশ্রম করতে পারে!

চারু বলে,

–আর মেয়েটা- মেন্দী?

–মেয়েটা জীবনে খুব দুঃখ পেয়েছে মনে হয়, কথাই তো বলে না। দিনরাত শুধু কাজ করেই যায়। খুব বিশ্বাসী মেয়ে, তাই না?

–হ্যা। তুলি, আমাকে এখন যেতে হবে।

তুলি তার জামা টেনে ধরে বলে,

–কোথায়?

–ডিউটিতে। এখন একটা মেলট্রেন আসবে।

–না, তুমি যেতে পারবে না। ফাটুকে দিয়ে খবর দাও, তুমি অসুস্থ!

–এর কোনো মানে হয় না।

তুলি ভেংচি কেটে তার কথাটাই বলে,

–এর কোনো মানে হয় না।

–লক্ষীটি, আমি যাবো আর আসবো। আধ ঘন্টার মধ্যেই আমি ফিরে আসবো।

একটু চীৎকারের মতো করে তুলি বলে,

–না। আমার এই সামান্য ইচ্ছেটুকু তুমি পূরণ করতে পারবে না?

–ইচ্ছেটা কি? বলবে তো।

–আমার খুব ঘুম পাচ্ছে, তোমার বুকে মাথাটা রেখে আমি একটু ঘুমুবো।

–এই অসময়ে?

–এখনও তো বিয়ের গন্ধ শরীর থেকে মুছে যায়নি? এই ক'টা দিনের মধ্যেই সময়-অসময় হিসেব করছো?

চারু মনে মনে বলে, একটু বেশী বয়সে বিয়ে করেছি তো, আদর আবদার রাখতেই হবে। তা নইলে অন্য কিছু ভাববে। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে জাপটে ধরলো তুলিকে। তুলি আরও ছায়ার মতো মিশে যেতে চাইছে চারুর শরীরের সঙ্গে।

তিন

বাড়িতে ঢুকেই মেন্দী মেয়েটা হঠাৎ থমকে গেলো কেন? বাড়িটা কেমন যেন শূন্য শূন্য লাগছে মেন্দীর কাছে। কোথাও কোনোরকম শব্দ নেই। পাখিরাও কী আগে থেকেই টের পায় সব? এই ভোর বেলায় এ বাড়িতে একটা পাখিও তো কিচির-মিচির শব্দ করছে না।

এ ক'দিন মেন্দী বাড়িতে ঢুকেই দেখেছে, শিউলি তলায় ভাবী শিউলি ফুল কুড়াচ্ছে। আজও অসংখ্য শিউলি ফুল পড়ে আছে ঘাসের উপরে, কিন্তু ভাবী নেই! ভাবী হয়তো দরোজা দিয়ে আজ ঘুমুচ্ছে। তবু মনটা কেমন যেন করছে মেন্দীর। কেবলই মনে হচ্ছে বাড়িটা আজ খালি খালি লাগছে কেন?

ও– মনে পড়ছে। মনে পড়ছে। মাস্টার সাহেব নেই তো। গতকাল বিকেলের ট্রেনেই ঢাকায় গেছে। হেড অফিসে। সেই জন্যই বোধ হয় এমন খালি খালি লাগছিলো সারা বাড়ি। প্রতিদিন সকালে মেন্দী এসেই রান্নাঘরের দরোজা খুলে। চাবিটা ওর কাছেই থাকে। এই ভোর বেলাতেই অনেক কাজ-কর্ম করতে হয় মেন্দীর। বাসি থালাবাসনগুলো মাজতে হয়। ঝাট দিতে হয় সবখানে। তারপর সকাল বেলার নাশতা তৈরী করতে হয় তাকেই। আজও সে সবই করছে। তারপরও মাঝে মাঝে মনটা হঠাৎ থেমে যায়। থমকে থাকে। মনে মনে বলে, মাস্টার সাব নেই, ঠিক আছে। কিন্তু বাড়িটা এতো শূন্য শূন্য লাগছে কেন? কাজ করতে করতেই থমকে যায় মেন্দী। এদিক ওদিক তাকায়। নিঃশব্দ বাড়িটায় কোনো শব্দ খোঁজে বোধ হয়। আবার কাজে মন দেয় মেন্দী। নিজেই নিজের কাজের শব্দ করে খুব জোরে জোরে। যেমন থালা-বাসনগুলো মেজে-ঘষে খুব শব্দ করে রাখে। জলেরও যেন শব্দ হয় কলকল করে, এমনভাবেই সে জল ঢালছে। আর মনকে বারবার সান্ত্বনা দিচ্ছে, মাস্টার সাহেব বাড়ি নেই। ভাবীজান ঘুমুচ্ছে। কিন্তু মন তা মানছে না। বরং জিজ্ঞাসা করছে, পাখি? ভোরবেলায় পাখিরা তো আসবে। ডালে ডালে কিচির-মিচির করবে। এখন পর্যন্ত একটা পাখিও এলো না এই বাড়িতে। কারণ কি? একা একাই যেন রেগে যায় মেন্দী। মনকে ধমক দেয়, এতো জ্বালাতন করিস নাতো, আমারে কাজ করতে দে।

ফাটুর কথা শোনে যেন আসমান থেকে পড়লো মেন্দী।

–কস কী?

ফিসফাস করে ফাটু বলে,

–হ। ভাবী ঘরে নাই। দ্যাখস নাই, দরজায় তালা ঝুলতাছে?

এইবার শোবার ঘরের দরোজার দিকে তাকায় মেন্দী। হ, কথা সত্যি। বড় একটা তালা ঝুলছে দরোজায়। বুক

গলা শুকিয়ে যাচ্ছে মেন্দীর। প্রশ্ন একটাই, ভাবী তাহলে গেলো কোথায়। মেন্দী বলে,

–আমি গেলাম ত রাইত দশটায়। তখনও তো ভাবীরে ঘরে দেইখা গেলাম। আমি কইলাম, ভাবী যাই। ভাবী একটা বই পড়তেছিলো। আমার দিকে না তাকিয়েই বললো,

–যা, কিন্তু কাল একটু সকাল সকাল আসিস।

মেন্দীর কথা শোনে ফাটুর শরীরটা খুব জোরে একটা মোচড় দিল। তার ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে,

–আরে তুই ত গ্যাছস রাত দশটায়। আমি দেখছি ভাবী রাইত বারোটা পর্যন্ত টিভি দ্যাখতাছে। দরোজার ফাঁক দিয়ে আমি একটু উঁকি দিছিলাম, ভাবী সঙ্গে সঙ্গেই আমার দিকে তাকিয়ে বললো,

–কে? ফাটু। এতো রাত পর্যন্ত জেগে আছো কেন? যাও, ঘুমাও, বেশী রাত জাগলে সকালে উঠতে পারবে না, যাও। আমি তখখুনি গিয়া শুইয়া পড়ছি।

দু'জনের কেউই ভাবতে পারছে না সেই ভাবী গেলো কই? কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তো তার আলামত পাওয়া যেতো। হয়তো দরোজাটা খোলা থাকতো। গয়নাগাটি টিভিসহ সব লুট হয়ে যেতো। ভাবীর হাত পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে ডাকাতি করতো। কিংবা আজকাল যা হচ্ছে, ভাবীকে খুন করে লাশ গায়েব করলেও তো একটা চিহ্ন পাওয়া যেতো। যতো বড় চোর ডাকাত খুনী সন্ত্রাসী হোক না কেন? ভুল করে ফেলে যাওয়া তাদের চিহ্ন একটা পাওয়া যায়। সেই সূত্র ধরেই তো পুলিশ খোঁজাখুঁজি করে।

মেন্দী খুব জোরে ধমক দেয় ফাটুকে,

–তুই বেশী বেশী চেন্তা করতাছস? ভাবীর কিচ্ছু অয় নাই। হে নিজেই সব গোছগাছ করে কোনোখানে গেছে।

–একজন, একটা মেয়ে মানুষ, তাও নতুন বউ, এতো রাইতে একলা একলা কই যাইবো? ফাটুর পাল্টা ধমক খেয়ে চুপ হয়ে যায় মেন্দী। ফাটুর যুক্তিটাতো ঠিক আছে। এতো রাতে নতুন বউ একা একা কোথায় যাবে?

দু'জনেই চুপচাপ। কি বলবে না বলবে, তাও ভেবে পাচ্ছে না। বেলা বাড়ছে। আশ্বিনের ঝকঝকা রোদ ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। দশটার দিকে একটা লোকাল ট্রেন আসবে। যাত্রীদের হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে এখান থেকেই। ফাটু হঠাৎ করে বলে,

–আমি যাই।

ফাটুর মাথাটা একটু গরম থাকে। যে কোনো ব্যাপারেই লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি একটু বেশী করে ফাটু। সেই তুলনায় মেন্দী খুব ঠান্ডা মেয়ে। মেয়ে মানুষ তো। তার মাথায় সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কারুকাজ বেশী। মেন্দী খুব আস্তে করে বললো,

–কৈ যাবি?

ফাটুর মুকটা খুব পরিষ্কার। সে ফট্‌ফট্‌ করে বলে ফেললো,

–ব্যাপারটা, কাউরে না কাউরে জানাইতে অইবো না? আমি যাই–

–না।

মেন্দীর ধমকটা ভীষণ কড়া শাসনের মতো শোনায়। থমকে যায় ফাটু। মেন্দী একদম ঠান্ডা গলায় বলে,

–কাউরে কিচ্ছু কইতে পারবি না।

–আমরা যদি বিপদে পইড়া যাই, তহন কী অইবো?

মেন্দী আরও নিরুত্তাপ গলায় বলে,

–আমরাতো বাইরেই থাকি। ভিতরে কী অইছে না অইছে আমরা ক্যামনে জানুম। আমরা তো কেউ এই বাড়ি থাইকা পালাইয়া যাইতাছি না। ঐ যে, ঘরের দরোজায় তালাটা ঝুলছে, অইটাই বড় সাক্ষী। আমগো কাছে তো অই তালার চাবি থাকে না। থাকে?

–না!

অনেকক্ষণ পর, মাথা চুলকাতে চুলকাতে ফাটু বলে,

–তারপরও এই স্টেশনের দুই-একজনরে সব ঘটনা কইয়া সাক্ষী রাখা উচিত? তুই মানা করতাছস ক্যা?

মেন্দী যেন খুব চিন্তা-ভাবনা করে বলে,

–মাস্টার সাব খুউব ভালো লোক। তোরে আর আমারে নিজের মানুষ মনে করে। মাস্টার সাব ইস্টিশনে নাই। নতুন বউ, রাইত গভীরে কই জানি চইলা গেছে, এই কথাটা যদি মানুষ জানে, তাইলে কী মনে করবো? কলঙ্ক রটাইবো না?

লাঠি অলার লাঠি ধরন যায়, কিন্তু মুখ অলার কথা ধরন যায় না। ব্যাপারটা জানলে মানুষ কতো ধরনের কথা ছড়াইবো জানিস? মাস্টার সাব এইখানে আর কাউরে মুখ দেখাইতে পারবো না। লজ্জায় চাকরি ছাইড়া চইলা যাইবো।

মেন্দীর এতো কথা শুনে, ফাটু নিজের মাথাতেই নিজে একটা ঘুষি মারে। কাজের মেয়ে মেন্দী এতো সুন্দর সুন্দর বুদ্ধির কথা বলতে পারে। ওর মাথায় কেন এই বুদ্ধিগুলো ঢোকে না। কোনোদিন একটা বুদ্ধির কথা বলতে পারলো না কাউকে। অই শালা 'বারো বছর' শব্দটাই ওর সব বুদ্ধি কাঠঠোকরার মতো ঠুকঠুক করে খেয়ে ফেলেছে। এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো হলো একদম চুপ থাকা। বোবার কোনো শত্রু নেই। মাটিতেই বসে পড়ে ফাটু। তার চোখ-মুখ দেখলে মনে হয়, সে শুধু সর্বক্ষণ একটা কথাই ভাবছে, এটা কী হলো?

কাজ-কর্ম থেমে নেই মেন্দীর। প্রতিদিনের মতই আজও সে চুপচাপ কাজ করেই যাচ্ছে। সকালের নাশতাও দিয়েছে ফাটুকে। খাবার বেলায় ফাটু সবার চাইতে একটু বেশীই খায়। কিন্তু আজ সে কিছুই খেতে পারলো না। একটা রুটি আর ভাজি কোনো রকম পানি দিয়ে গিলে থালাটা সরিয়ে রাখলো। তবে ঢক্ঢক্ করে পানি খেলো অনেক।

কখন মাস্টার সাহেব আসবে। কখন সমস্ত ঘটনা জানবে। এই চিন্তাতেই সে অস্থির। মেন্দীটা কি? মেয়ে জ্যোতিষ নাকি? হঠাৎ করে তার মনের কথা জানলো কী করে? সে যখন মাস্টার সাহেবকে নিয়ে ভাবছে, ঠিক তখুনি মেন্দী বললো,

–মাস্টার সাবের আগেও তো ভাবী ফিরে আইতে পারে?

মেন্দীকে আগে দেখতেই পারতো না ফাটু। কথাবার্তাও বলতো খুব কম। কোনোদিনই এক মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতো না মেন্দীর সামনে। বাজারটা রেখেই চলে যেতো। মেন্দী কিছু বললে, কখনও তার কাছে যেতো না ফাটু। দূর থেকেই শুনে তার প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতো। ফাটু বলেই দিয়েছিলো মেন্দীকে,

–আমার খাবার সময় তুই সামনে থাকবি না। মেয়ে মানুষ কাছে থাকলে আমার খাইতে খুব অসুবিধা অয়।

মেন্দীও সেই রকম; খাবার-দাওয়ার সব রেখে দিয়ে, অন্য কোথাও, এই সংসারেরই অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতো।

কিন্তু আজ সেই ভুলটা ভাঙলো ফাটুর। অন্যের বাড়িতে কাজ করলে কী হবে, মেন্দী খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। স্বামীর ঘর করতে পারেনি, ওটা তার ভাগ্য। মেয়ে খারাপ না। খুব খারাপ ছিল বোধ হয় ওর স্বামীটাই। শালার বেটা বুঝতে পারেনি, ছাইয়ের ভেতরে খাঁটি সোনার টুকরো ছিল।

ফাটুর একবার মনে হলো স্টেশনে যাই। অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের সাহেব

ক’দিনের ছুটি নিয়েছে। কবে আসবে। আবার মনে হলো, ব্যাপারটা আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নিয়ে লাভ কী! এসব কথা জিজ্ঞেস করতে গেলে, উনি যদি আবার ভাবীর কথা জিজ্ঞেস করে? তখন সে কী বলবে?

বুকটা শুকিয়ে যাচ্ছে। বারবার পানি খাচ্ছে। চিন্তা করতে করতে খুব ঘামছে। আবার সেই শরীরের ঘাম শরীরের ভেতরেই শুকিয়ে যাচ্ছে। ভয়ানক এক অস্বস্তিতে ভুগছে ফাটু।

হঠাৎ মনে হলো, রাত তিনটেয় একটা মেলট্রেন যায় ঢাকায়। ভাবী কি কাউকে না জানিয়ে ঐ ট্রেনেই চলে গেছে?

খুব দ্রুত মেন্দীর কাছে এসে, ভীষণ রকমের ছটফট ভাব নিয়ে বললো,

–মেন্দী, আমার মনে অয়, ভাবী রাইত তিনটার মেলে একা একাই চইলা গেছে?

ফাটুকে একবার দেখে নিয়ে মেন্দী বলে,

–ভাবী যাবো ক্যান? সাইবের সঙ্গে কী ঝগড়া অইছে?

–ঝগড়া? আমগো সাহেব কি ঝগড়া করার মানুষ! বিয়া অইছে মাত্র কয়েকদিন।

এই কয়টা দিন ত ভাবীর মুখে খালি হাসিই দেখলাম। ঝগড়া অইবো ক্যান?

–তুই যে কইলি ভাবী চইলা গেছে?

এখন খুব বোকা বোকা লাগছে ফাটুকে। মেন্দীর কথা শুনে থমকে আছে।

মেন্দী ভীষণ তেজী গলায় বলছে,

–এইসব কথা কাউরে কইবি না। কেঁচু খুঁড়তে গিয়া সাপ বাইর অইয়া যাইবো। বুঝছস? তরে না কইছি চুপচাপ থাক, আমগো সাহেব আসুক। তারপরে কথা কইবি।

সত্যি আর কোনো কথা বলে না ফাটু। এই কোয়ার্টার থেকেও বাইরে যায় না। স্টেশনে ট্রেন আসছে। যাত্রীদের হৈচৈ শোনা যাচ্ছে। আবার চলেও যাচ্ছে ট্রেন। দু’তিন মিনিটের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে স্টেশন। এখান থেকে সবই বোঝা যাচ্ছে। একটু উঁকি মারলে সব দেখাও যাবে।

দুপুর গড়িয়ে গেলো। আশ্বিনের ঝকঝকা রোদ হলুদ হয়ে গেলো চোখের সামনেই। কোথাও একটু বাতাস নেই। একটা গাছের পাতাও নড়ছে না। চতুর্দিকের সব কিছুই যেন স্থির হয়ে আছে।

মনে মনে ভাবছে ফাটু। ভাবী খুব লক্ষ্মী মেয়ে। যেন তাকে পেয়েই অসংখ্য শিউলি ফোটে রাতে। ভোর হতে না হতেই, পাখিরা ছুটে আসে এই বাড়িতে। অনেকগুলো পাখি এক সঙ্গে কিচির-মিচির করে। পাখি তো, ওদের ভাষা আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু ফাটুর মনে হয়, ওরা যেন বলতে চায়, ওগো নতুন বউ, আর কতো ঘুমাবে? এইবার ঘুম থেকে উঠো। আমরা তোমার ঘুম ভাঙাতে এসেছি। কী আশ্চর্য, ভাবী কি সমস্ত পাখিগুলোকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে! ভোর থেকে এখন পর্যন্ত, আজ একটা পাখি দেখলাম না এই বাড়িতে। শুনেছি, পৃথিবীতে ঝড় এলে, পাখিরাই সবার আগে সেই ঝড়ের সংবাদ পায়। ভাবীর ব্যাপারে কী পাখিরা আগেই জানতে পেরেছে। সেই জন্যেই কী কোনো পাখি আর এই বাড়িতে আসছে না? বাড়িটা শূন্য বলেই এতোসব ভাবনা ফাটুর মাথার ভেতরে জমা হয়ে আছে। তা নইলে এইসব ফুল-পাখি নিয়ে জীবনেও কোনো ভাবনা-চিন্তা করার অবসরই পায় না ফাটু।

ফাটু আর মেন্দীর মাস্টার সাহেব এলেন রাত সাড়ে দশটার মেলট্রেনে। কোয়ার্টারে ঢুকেই, দরোজায় তালা ঝুলছে দেখে থমকে গেলো চারু মাস্টার সাহেব। একটু জোর গলাতেই জিজ্ঞাসা করলো,

–দরজায় তালা ঝুলছে কেন?

কোনো উত্তর না পেয়ে আবার চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলো,

–দরজায় তালা ঝুলছে কেন?

এইবার ফাটু মাথা নীচু করে ফ্যাসফ্যাসে গলায় সব খুলে বললো। পাথরের মূর্তির মতো মাস্টার দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। দুঃসংবাদটা শুনে এতোক্ষণ তার মনের সব ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলো কী? কোনো কথাই বললো না অনেকক্ষণ। তারপর পকেট থেকে ডুপ্লিকেট চাবিটা বের করে তালা খুলে ঘরে ঢুকলো মাস্টার। দরোজার সামনেই দাঁড়িয়ে রইলো ফাটু আর মেন্দী।

ঘরের ভেতরের সব কিছুই সাজানো আছে। কোনো কিছুই এদিক-সেদিক হয়নি। বিছানায় নতুন চাদর। নতুন বালিশ। সেই বিছানার উপর কিছু শিউলি ফুল ছড়ানো আছে। মাস্টার সাহেব প্রথমেই তুলির সুটকেসটা খুঁজলো। ওটাও ঠিক জায়গামতোই আছে। মাস্টার শুধু মনে মনে ভাবলো, ও যখন চলে গেলো, নিজের সুটকেসটা নিয়ে গেলো না কেন?

আলনায় মাস্টার সাহেবের জামা-কাপড়ের সঙ্গে তুলিরও কিছু শাড়ী এবং সেলওয়ার কামিজ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আবার মাস্টারের মনে হলো, সে কি এক কাপড়ে কোথাও গিয়েছে? তার সবই তো রয়ে গেছে। কী এমন কাজে সে এক কাপড়ে চলে গেলো, কাউকে কিছু না বলে?

দিন-কালতো ভালো না। ও দেখতে খুব সুন্দরী। গুন্ডা-পান্ডারা কী মুখ বেঁধে তুলে নিয়ে গেছে তুলিকে? সে রকম কিছু যদি হয়, তাহলে দরোজায় আবার তালা ঝুলবে কেন? সন্ত্রাসীরাতো আজকাল অনেক নতুন টেকনিকে সন্ত্রাস করছে। সন্ত্রাসীই যদি হবে, তাহলে এই নতুন সংসারের সব কিছুই এতো সাজানো থাকবে কেন? আর কোনো কিছুই ভাবতে পারছে না মাস্টার সাহেব। তার হঠাৎ মনে হলো এই ঘটনা কী স্টেশনের সবাই জানে? মাস্টার সাহেব ফাটুকে জিজ্ঞেস করলো,

–ফাটু।

–জি।

–এই ঘটনা কি স্টেশনের সবাইকে বলেছিস?

–জি না। আমি কইতে চাইছিলাম, কিন্তু মেন্দী আমারে বারন করছে। কাউরে জানাইতে দেয় নাই?

মাস্টার মনে মনে মেন্দীর বুদ্ধির প্রশংসা করলো। একবার বোধহয় মেন্দীর দিকে তাকিয়েও ছিল, কিন্তু বাইরে খুব অন্ধকার। মেন্দী অন্ধকারে মিশে আছে। তাকে ঠিক স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না।

মাস্টার সাহেব আবার খুব গম্ভীর গলায় ফাটুকে বললো,

–ফাটু, এই ঘটনা, স্টেশনের কেউ যেন জানতে না পারে।

–জানবে না!

–তোর ভাবীর কথা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তখন কী বলবি?

এইবার আর কথা বলতে পারছে না ফাটু। মানে তার গরীব বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না, এই মুহূর্তে কি বলবে।

মাস্টার সাহেবই বলে দেয়।

–বলবি, বোধহয় বাড়িতেই আছেন। আমরাতো ঘরের ভেতরে যেতে পারি না। আমাদের নিষেধ আছে ঘরের ভেতরে যাওয়া। তোরা চলে যা এখন।

বাইরের অন্ধকার থেকে মেন্দী বলে খুব নীচু গলায়,

–রাইতে খাবেন না স্যার?

–না, ভাত-তরকারী যা আছে তুই নিয়ে যা।

মেন্দী ইশারায় ফাটুকে ডাকে। ফাটু কাছে যায়। মেন্দী ফিসফিস করে বলে,

–সাহেব অনেক দূর থাইকা আইছে। আমি উনার জন্য খাবার রাইখা গেলাম। ফাটু, আমগো সাহেবের এখন খুব দুঃসময়। সাহেব কইলেও তুমি যাইও না। সাহেবের কাছে-কাছেই থাইকো, আর যদি পারো, সাহেবরে রাইতে কিছু খাওয়াইও। এই বলেই খুব দ্রুত অন্ধকারে মিশে যায় মেন্দী।

এভাবে এতো তাড়াতাড়ি সব উলট-পালট হয়ে যাবে, এ কথা কী কখনও চিন্তা করেছে চারু? নতুন বউ, যার শরীর থেকে এখনও বিয়ের গন্ধ মুছে যায়নি? সে এইভাবে, কাউকে কিছু না বলে এতো নিঃশব্দে, গভীর রাতে কোথায় চলে গেলো? সে কি আবার ফিরে আসার জন্য গেছে? নাকি সে চিরদিনের জন্যই চলে গেছে। কোনো কিছুই ভাবতে পারছে না চারু। বেশী ভাবতে গেলে মাথায় কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। কেমন যেন শূন্য হয়ে যায় মাথাটা। চিন্তা বুদ্ধিগুলো যেন ভয়াবহ এক ঝড়ো বাতাসে সব এলোমেলো হয়ে গেছে। আগের মতো বুদ্ধিগুলো যেন আর সবুজ সতেজ নেই। মাথাটা খালি। ভীষণ রকমের শূন্য। ভাবতে গেলেও আর কিছু ভাবতে পারে না চারু।

বিশেষ করে এই বয়সে, এই বিয়ে বিয়ে সুগন্ধী দিনগুলোর সময়, যদি কোনো চাকরিজীবী মফস্বল টাউন থেকে ঢাকায় যায় কোনো কাজে। তখন তার ইচ্ছে হয়, প্রিয় মানুষটার জন্য। ওর পছন্দ হবে, খুশীতে নেচে উঠবে, এমন সব কিছুই কেনাকাটা করে। অনেক সময় মনে হয়, দোকানে যা যা আছে, সবই কিনে ফেলি। কোনোদিন কারো পক্ষেই তা সম্ভব হয় না। টাকা-পয়সার একটা হিসেব আছে। অই হিসেব অনুযায়ীই সব কেনাকাটা করতে হয়। আনন্দে নেচে উঠা মনটা তখন ক্ষুব্ধ হয়ে যায়। খুঁতখুঁত করে। মনের ইচ্ছা সব কিছুই নিতে হবে। কিন্তু টাকা পয়সাতো সব কিছুই কিনতে পারে না। চারু তবু অনেক কিছুই কিনেছে তুলির খুশী-খুশী মুখ দেখবে বলে। ইন্ডিয়ান শাড়ী। সেলওয়ার কামিজ। নকল মুক্তোর মালা। ডায়মন্ড কাটিং কাচ বসানো আংটি। বিদেশী পারফিউম। টুকিটাকি আরও অনেক কিছুই। যা দেখলেই তুলির খুব পছন্দ হবে। অমূল্য এক হাসিতে ভরে যাবে তার মুখ। ভালোবাসা উপচে পড়বে ডাগর দুটি চোখ থেকে।

এসব এখন কাকে দেবে? সেই তুলি গেলো কোথায়। আমাকে না বলে কোথাও তো যাওয়ার কথা নয়। কখনও কোনো নতুন বউ কি এইভাবে না বলে কোথাও গেছে? এ রকম কথা জীবনে কখনও শোনেনি চারু। হ্যা, বাসর ঘর থেকে মেয়ে চলে গেছে এমন গল্প শুনেছে চারু। সেতো হৈচৈ করে, সবাইকে জানিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় না জানালেও পরে সবাই জেনে গেছে। অই বিয়েও ভেঙে গেছে, সে মেয়ে আর জীবনে এমুখো হয়নি। কিন্তু তুলি তো গেলো নিঃশব্দে। সম্ভবত খুব গভীর রাতে। নিজের সব কিছুই স্বামীর সংসারে রেখে। গোটা সংসার গোছগাছ পরিপাটি করে কী কেউ কখনও যায়? ভাবতে পারছে না চারু। ভাবতে গেলেই মাথাটা সাদা হয়ে যায়। ধু ধু একখণ্ড চরের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকে। অনেকক্ষণ যাবত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে চারু। পাথরের মূর্তির মতই বসেছিল। হঠাৎ চোখ পড়লো ঘড়ির দিকে। এই রুমে ঘড়ির টিকটিক শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না এতোক্ষণ। ঘড়িতে এখন তিনটে বাজে। খুব তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো চারু। এই সময়ে ঢাকা থেকে একটা মেলট্রেন আসবে। দরোজা খোলা রেখেই স্টেশনে চলে গেলো চারু। দরোজার কাছেই অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলো ফাটু। ফাটুকেও সে দেখতে পায়নি। হনহন করে খুব দ্রুত চলে গেছে।

ফাটুর মনে পড়লো মেন্দীর কথাটা। মেন্দী বলেছিলো, সাহেবের মন খুব খারাপ। সাহেব যদি তোকে যেতেও বলে, তবু যাসনে। সাহেবের কাছাকাছিই থাকিস। মেয়েটার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। সাহেব তো দরোজাটা খোলা রেখেই চলে গেলো। ঘর ভর্তি কতো দামী-দামী জিনিস। স্টেশনে তো চোর-পকেটমার থাকেই। এখন যদি তারা কেউ টের পেতো, সর্বনাশ হয়ে যেতো না! দরোজাটা বন্ধ করে দেবে কি দেবে না, ফাটু এই চিন্তাই করলো অনেকক্ষণ। তারপর ভাবলো, দরোজা দিলে যদি সাহেব ফিরে এসে রাগারাগি করে। থাক, খোলাই থাক। আমি তো এখানেই আছি।

ট্রেন চলে গেলো। ফাঁকা হয়ে গেলো স্টেশন। রাতের ট্রেনের সময় খুব বেশী ভিড় থাকে না। ট্রেনটা এসেই দু'তিন মিনিটের মধ্যেই চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই স্তব্ধ হয়ে যায় রাতের স্টেশন।

স্টেশনের কাজ-কর্ম শেষ করে, সাহেব আবার ফিরে এসেই ঘরে ঢুকলো। দরোজাটা খোলা কেন? এই মনে করে এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না। দরোজাটা খোলা কী বন্ধ থাকে, এসব চিন্তা-ভাবনা তখন তার মাথার ভেতরেই নেই। ফাটু বুঝতে পারে না, তার সাহেব এখন কী ভাবছে। তবে এইটুকু বুঝতে পারছে, শূন্য ঘর দেখে মনে খুব বড় একটা আঘাত পেয়েছে সাহেব। যে আঘাতের কোনো শব্দ নেই, সেই আঘাতে কষ্ট অনেক বেশী।

দরোজাটা খোলাই আছে। ঘরের বাতিও জ্বলছে। বাইরে কিন্তু ভোরের ছোট ছোট হাওয়া ছুটাছুটি করছে। সে হাওয়ায় শিউলি ফুলের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। বাড়িতে সাহেব এসেছে বলেই কী আজ দু'তিনটে পাখি এসে কিচির-মিচির শুরু করেছে। পাখিরা কী মানুষ চেনে? ভাঙা পরিত্যক্ত বাড়িতে পাখিদের আনাগোনা খুব কম থাকে। কিন্তু একটা সচ্ছল বাড়ির গাছে গাছে পাখি আসে। হৈ চৈ কিচির-মিচির করে। উড়ে যায়। আবার ফিরে আসে। কখনও কখনও ডালে বসে কোনো কোনো পাখি ঝিম ধরে থাকে। ঘুমায়।

মাস্টার সাহেব কিন্তু অই একভাবেই বসে আছে ঘরে। নীরব নিশ্চুপ। সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা দুটো ব্যথায় টনটন করছে। ফাটু ভাবলো, এখুনি মেন্দী চলে আসবে, আমি একটু ঘুরে-ফিরে আসি।

মেন্দী মেয়েটা ঘড়ির মতই কাঁটায় কাঁটায় এসে হাজির হয়। ঝড়-বৃষ্টি হলেও তার কখনও দেরি হয় না। এ বাড়িতে এসেই রান্নাঘরে ঢুকে। কিন্তু আজ এ বাড়িতে এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মেন্দী।

তার সাহেব দাঁড়িয়ে আছে শিউলি তলায়। অসংখ্য শিউলি পড়ে আছে ঘাসের উপর। সাহেব কয়েকটা শিউলি ফুল কুড়িয়ে হাতে নিলো। অবাক হয়ে দেখতে লাগলো হাতের মুঠোয় শিউলি ফুলগুলোকে। মেন্দী আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ঢুকে পড়লো রান্নাঘরে।

মানুষের দুঃখগুলোও বোধহয় আস্তে আস্তে হিম হয়ে আসে। বরফ হয়ে যায়। জমে থাকে হৃদয় জুড়ে। অনেক সময় খুব কাঁদতে পারলে, দুঃখের বোঝাটা হালকা হয়। চারুতো কাঁদতেও পারছে না। এই দুঃখটা বড় অন্যরকম দুঃখ। কাউকে বলাও যায় না। কান্নাকাটি করাটাও মানায় না। শুধু মুখ বুঁজে সব সহ্য করতে হবে। একেক সময়, নীরবেই দু'চোখ ভরে জল আসে। তাও আবার গোপনেই মুছে ফেলতে হয়। এ জ্বালা যে কি জ্বালা, তা শুধু চারুই বুঝতে পারছে।

একবার ভাবলো, এই নিয়ে কি মাকে চিঠি লিখে জানাবে? পর মুহূর্তেই মনে হলো অসম্ভব। মাকে জানানোই যাবে না। মা কিছু জানলেই হৈচৈ করে ছুটে আসবে এখানে। চারুকে নানা রকম প্রশ্ন করবে! হাউমাউ করে কাঁদবে। চারুর এতো দুঃখ মা সহ্য করতে পারবে না। ঝড়ের মতো ছোটাছুটি করবে তুলির খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে। মাকে তো আর থামানো যাবে না। ব্যাপারটা সবাই জেনে ফেলবে। তখন মানুষের সামনে মুখ দেখানোই মুশকিল হবে। মা তো একা আসবে না। মিতু-ঋতুকে সঙ্গে নিয়েই আসবে। সঙ্গে না আনতে পারলেও ওদের কাছে টেলিগ্রাম করবে আসার জন্যে।

মিতু-ঋতু কি চুপ থাকবে? কখখনও না। মা'র চাইতে ওরাই বেশী অস্থির হয়ে যাবে। চারু এতোদিন ওদের কারণেই বিয়ে করেনি। ওরাই দিন-রাত খোঁজাখুঁজি করে এই মেয়েকে বের করেছে। ওদের পছন্দ মতই চারু বিয়ে করেছে। সেই বউ যদি এভাবে চলে যায়, এমন খবর পেয়ে ওরাই তো হৈ চৈ করবে বেশী। ওদের স্বামীরা আসবে। থানায় ডাইরী করবে। পত্রিকার নিখোঁজ কলামে খবর ছাপাবে। সে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটে যাবে চতুর্দিকে। শেষ পর্যন্ত চারু নিজেকে খুব শক্ত হয়ে ভাবলো, না এসব কাউকেই সে জানাবে না।

একবার শ্বশুরবাড়ির কথা মনে হলো, তাদেরকে একটা খবর দেয়া উচিত। তাদের মেয়ে, হঠাৎ এইভাবে নিঃশব্দে চলে গেলো। অন্তত এই খবরটুকু তাদের দিতে হয়। এটা নিয়মের মধ্যেই পড়ে। আবার হঠাৎ মনে হলো, তুলি তো ওদের কাছেই চলে যেতে পারে। আর যদি না গিয়ে থাকে, আজ না হোক, দু'দিন পরে হলেও তুলি তাদেরকেই জানাবে, সে কোথায় আছে। যদি বেঁচে থাকে, তাহলে এসব ঘটনা ঘটবে। আর যদি কোনো

দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়, তখন কী হবে? আর ভাবতে পারে না চারু। ভেতরটা ঝনঝন করে যেন কাচের মতো ভেঙে পড়ে। তার সমস্ত বুদ্ধি অচল হয়ে যায়। মেধাহীন একটা ভারি মাথা নিয়ে শুধু স্তব্ধ হয়ে থাকে চারু।

এক সময় মনে হলো, তুলি বুদ্ধিমতী মেয়ে। এতো নিঃশব্দে চলে যেতে পারে না। এ সংসার ভালো না লাগলে অন্তত দু'লাইনের একটা চিঠি রেখে যেতো। অথবা ফাটু কিংবা মেন্দীকে কিছু বলে যেতো। এভাবে, কাউকে কিছু না জানিয়ে, এতো গভীর রাতে নিঃশব্দে চলে গেলো কেন? জোর করে কেউ ধরে নিয়ে গেলেও তো তার কিছু চিহ্ন পড়ে থাকতো, যা দেখলেই বোঝা যেতো তুলিকে হরণ করেছে কেউ।

সে-সব তো কিছুই নেই। সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো সংসার। খুব ঠাণ্ডা মাথায় দরোজায় তালা দিয়ে চলে গেছে।

এ রকমভাবে যাওয়ার পেছনে অন্য কোনো রকম যুক্তি দাঁড় করানো যায় না। বোঝা যাচ্ছে, তুলি স্বেচ্ছায় চলে গেছে। এমন জায়গায় গেছে, যা কাউকে বলে যাওয়া যায় না। ইচ্ছা থাকলেও বোধহয় কিছু বলার কোনো উপায় ছিল না।

চার

কাজে কোনো ফাঁকি দেয় না চারু। সময়মতই স্টেশনে যায়। কাজ করে। অফিসের সবার সঙ্গে আগের মতই কথাবার্তা বলে। চা খায়। সুবিধা অসুবিধার কথা শোনে মনোযোগ দিয়ে। কাজে কেউ কোনো ভুল করলে রেগে যায় না। তাকে বোঝায়। সংশোধন করার চেষ্টা করে। কেউ একটু দেরি করে অফিসে এলে আগের মতো ধমকায় না। ঠাণ্ডা মেজাজে নিয়মিত হতে বলে। স্টেশন মাস্টারের অনুপস্থিতিতে এই নিয়ে আলাপ-আলোচনাও হয়। কেউ কেউ বলে, বিয়ে করলে মানুষের যে কতো পরিবর্তন হয়, তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ হলো, আমাদের এই স্টেশন মাস্টার।

এখন এক অদ্ভুত ডিউটি পালন করতে হয় ফাটুকে। কী দিন কী রাত! সাহেব কখনো ঘরের দরোজা দেয় না। একদম খোলা রাখে। ডিউটিতে গেলেও দরোজা খোলা রেখে চলে যায়। গভীর রাতে ঘুমিয়ে পড়লেও দরোজা খোলাই থাকে।

এই দু'তিন দিনেই সাহেব যেন কেমন হয়ে গেছে। অফিসে গেলে একটু কথাবার্তা বলে ঠিকই কিন্তু বাকী সময়টা যেন একটা নীরব মানুষ চলাফেরা করে। খায় দায়। ঘুমায়। বই পড়ে। বিভিন্ন ধরনের বাংলা গান শোনে। অথচ কোনো কথা থাকে না তার মুখে। একা একাই ভীষণ নীরব থাকে। বাজারের টাকা চাইলেও কোনো কথা বলে না। মানিব্যাগ থেকে শুধু টাকা বের করে দেয়। কতো খরচ করবে। কতো ফিরিয়ে আনবে। এসব কিচ্ছু বলে না। সব দায়-দায়িত্বই যেন ফাটু মিয়ার।

মেন্দী মেয়েটাকেও কখনো হুকুম করে না সাহেব। খাবার দিলে খায়। না দিলেও কোনো কথা বলে না। ডাকাডাকি করে না। আগে তো মাঝে-মধ্যেই বলতো,

–মেন্দী, এক কাপ চা দিতে পারবি এখন?

যা হয়েছে, তাতো মেন্দী আর ফাটুই জানে। দিন-রাতের মধ্যে তাদের সঙ্গেও কী দু'একটা কথা বলবে না? ধমক-টমকও তো দিতে পারে। কথা না বলে একটা মানুষ থাকে কী করে? দম বন্ধ বন্ধ লাগে না? এভাবে এতো নীরব থাকলে তো সাহেব একদিন পাগল হয়ে যাবে। মেন্দী আর ফাটু, ওরা দু'জন আলাপ আলোচনা করেই ঠিক করেছে, যে করেই হোক সাহেবকে কথা বলাতে হবে।

সাধারণত শোবার ঘরে যায় না ফাটু। কিন্তু আজ সরাসরি ঘরে ঢুকেই বললো,

–বাজারে যাইতাছি, কি মাছ আপনের পছন্দ, হেইডা কইয়া দ্যান। সাহেব কোনো কথা না বলে এমন একটা ভঙ্গী করলো, তার অর্থ হলো, আমার আর কোনো পছন্দ নেই। তুই যা আনবি, তাই খাবো। আরও কিছু কথা বলতে চেয়েছিল ফাটু, কিন্তু তার আগেই সাহেব ইশারা দিলো চলে যেতে। তখন তো আর দাঁড়িয়ে থাকতে

পারে না। ইচ্ছা না থাকলেও ফাটু চলে আসতে বাধ্য হলো।

মেন্দী কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করেনি সাহেবকে। বাজার থেকে আনা আজ টাটকা তরতাজা মাছগুলো বড় একটা বলে নিয়ে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলো মেন্দী,

–স্যার, মাছগুলা খুব টাটকা, কয়টা মাছ ভাইজ্যা দিমু আপনেরে।

শুয়েছিল চারু সাহেব। মেন্দীকে ঘরের ভেতরে দেখেই যেন এক লাফে উঠে বসলো সাহেব। ধমক-টমক তো দিলোই না। চোখ-টোখ লাল করে এমনভাবে তাকালো মেন্দীর দিকে। মেন্দী এই তাকানোর অর্থ বুঝে। মুহূর্তের মধ্যেই মেন্দী যেন ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

তারপরও ঢিব-ঢিব করা বুক নিয়ে কান পেতে রেখেছিল মেন্দী। ওর ধারণা, এখখুনি সাহেব তাকে ও-ঘর থেকেই ধমকাবে চড়া গলায়। কড়া কড়া কথা শোনাবে। সাবধান করে দেবে, সে যেন ও-ঘরে আর না যায়।

কতো সময় কেটে গেলো। সাহেবের একটা কথাও শোনা গেলো না এখান থেকে। অফিস থেকে আসার পর সেই যে নীরব হয়ে আছে। এখনও নীরব হয়েই পড়ে আছে। ফাটু আর মেন্দী মেয়েটা এইবার যেন সুনিশ্চিত হয়ে গেছে। সাহেবের এই নীরবতা কিছুতেই ভাঙানো যাবে না। বাড়িতে যদি আকাশ থেকে উড়োজাহাজও ভেঙে পড়ে। বিধ্বস্ত হয়। তারপরও সাহেব কোনো কথা বলবে না।

আজ কী বৃষ্টি হবে নাকি? আশ্বিন মাসেও ঝকঝকে আকাশটা হঠাৎ মেঘলা হয়ে যায়। ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও হয়। আজকের আকাশ দেখে মনে হয়, ভারি বর্ষণ হতে পারে। সামনেই সার্বজনীন দুর্গাপূজো। পূজোর সময় তো বৃষ্টি হবেই। সারা জীবনই এ সময় বৃষ্টি দেখেছে। কম আর বেশী, বৃষ্টি হবেই। সবচাইতে বেশী বৃষ্টি হয় দুর্গার বিসর্জনের পর। একটানা পাঁচ-ছ'দিন বৃষ্টি থাকে। ছোট বেলায় দাদু-দাদীর কাছে এই নিয়ে একটা গল্প শুনেছে চারু। দাদী বলতো, দুর্গা এসেছে বাবা-মা'র বাড়িতে। ক'টা দিন থাকবে। মনের ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াবে। দশমীতে আবার বিদায় নিয়ে চলে যাবে স্বামীর বাড়িতে। দেখবি, ঠিক তখন থেকেই বৃষ্টি শুরু হবে। কেন জানিস? দুর্গার স্বামীর নাম মহাদেব। ভীষণ রাগী মানুষ। দুর্গাকে ঘরে ঢুকতে দেয় না। মহাদেবের ধারণা, বাপের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল, কার হাতে কী খয়েছে কে জানে। মুচির ঘরেও খেতে পারে। মেথরের ঘরের খাবারও খেতে হয় তাকে। মহাদেব মনে করে দুর্গা এখন অপবিত্র। যাবে না তাকে ঘরে তোলা। দুর্গা তখন কাঁদে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। দুর্গার দুঃখ দেখে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে দুর্গা দিন-রাত বৃষ্টিতে ভিজে। এই বৃষ্টি থাকে একটানা পাঁচ-ছ'দিন। তারপর যখন রোদ উঠবে, তখন মনের দুর্গার দুঃখের দিন শেষ। মহাদেব মনে করে, এ ক'দিন বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে দুর্গা পবিত্র হয়ে গেছে। এখন তাকে ঘরে তোলা যায়। মহাদেব দুর্গাকে নিয়ে যখন ঘরের ভেতরে যায়, মনে করবি, ঠিক তখুনি বৃষ্টি থামে। দশদিকে ঝিকমিক করে রৌদ্র উঠে। এসব হলো গেঁয়ো গল্প। গ্রামের মানুষ এ গল্প বানিয়েছে হাজার বছর আগে। একটানা বৃষ্টি দেখে দেখে কল্পনা করে।

হঠাৎ এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টারের ডাকাডাকিতে যেন ধ্যান ভাঙলো স্টেশন মাস্টারের। এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার বলছে,

– ভাবী কোথায় ভাবী, ও ভাবী।

এই কথা শুনে আরও চমকে উঠে চারু মাস্টার। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। এদিকে রান্নাঘরে বসে ফাটু আর মেন্দী মেয়েটা কাঁপছে। তাদের ধারণা, এখন কী হবে? কী উত্তর দেবে সাহেব।

এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার মানে খুব শর্ট করে বলে এ.এস.এম। উনার নাম নাজমুল হক। উনার হাতে এখন ব্রহ্মপুত্রের লালচে একটা রুই মাছ ঝুলছে। উনি আবারও সেই কথাটাই বললেন,

–ভাবী সাব কোথায়, ভাবী সাব?

খুব আমতা আমতা করে ভীষণ নীচু গলায় চারু স্টেশন মাস্টারকে উত্তর দিচ্ছে,

–ও তো এখন বকুলতলায়, ওর এক আত্মীয়ের কাছে গেছে।

–আমার ভাগ্যটাই খারাপ, ভাবীর সঙ্গে দেখা হলো না। এই নিন, ধরুন। ব্রক্ষ্মপুত্র নদীর রুই মাছ। একবার খেলে সারাজীবন মনে থাকবে। বাড়ি থেকে আমার বাবা পাঠিয়েছে দুটো। একটা আমি রেখেছি, আরেকটা ভাবীকে দিয়ে গেলাম। চলি।

–বসবেন না একটু।

–খালি বাড়িতে বসে কী করবো। ভাবী আসুক। আরেকদিন এসে ভাবীর হাতের চা খেয়ে যাবো।

চলে গেলো এ.এস.এম নাজমুল হক সাহেব। স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এতোদিনের মধ্যে এই প্রথম মেন্দী মেয়েটাকে ডাকলো,

–মেন্দী?

রান্নাঘর থেকে ছুটে আসলো মেন্দী।

–এটা ধর।

মেন্দী রুই মাছটা হাতে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাস্টার সাহেব চলে গেলো শোবার ঘরে। হা করে দাঁড়িয়ে রইলো মেন্দী। মাছটা কী করবে? এখুনি রাঁধবে। কী দিয়ে রাঁধবে। কিছুই তো বললো না। ভাবটা এই, তোর কাছে দিলাম। তুই কী করবি তা তুই-ই জানিস। রাঁধতে ইচ্ছে হলে রাঁধবি। ফেলে দিলেও আমার কোনো আপত্তি নেই। এসব নিয়ে আর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবি না।

ফাটু কাছে এসে ফিসফিস করে বললো,

–মেন্দী, তরে একটা কথা কমু, রাখবি?

–কী?

–মাছটা বড়ই ত। ব্রক্ষ্মপুত্র নদীর রুইমাছ খুব নামকরা। আমাদের সাহেবের যে অবস্থা, মাছটা নষ্ট অইবো। কিছু রান্ধই। আর বাকীটা তুই কিছু নে। আমারে কিছু দে।

খুব শান দেয়া গলায় তার প্রতিবাদ করলো মেন্দী।

–না। তুই ত এই বাড়িতেই খাস, কম খাস না। এতো লোভ ভালো না, জিব্বাটা কাইট্যা ফ্যালা।

এই বলেই হনহন করে রান্নাঘরে ঢুকে পড়লো মেন্দী। আপন মনেই বিড়বিড় করে বলতে লাগলো ফাটু,

–আমার যদি লোভ থাকতো, সাহেব আমারে এতো বিশ্বাস করতো না। আমি কইলাম বাড়ির অবস্থা দেইখা। হয় নষ্ট অইবো, তা নাইলে তুই নিয়া যাবি। সাহেব ত খাবো দুই-এক টুকরা। বাকী তরকারী? তুই ত নিয়া যাবি। সাহেব ত বাসি কিছু খায় না। আমি এতো সোজা মানুষ, সোজা কথা কইলাম, আর তুই কথাটা নিলি বাঁকা কইরা। আমারে কইলি, লোভী। আমার সাদা দিলে তুই কিন্তু কালি মাইখা দিলি? ফাটু কখনো রেগে গেলে এই বাড়িতে থাকে না। বিড়বিড় করে বলতে বলতে বাইরে চলে যায়। স্টেশনের প্লাটফর্মে ঘুরে বেড়ায়। হাওয়া খায়। চায়ের দোকানে বসে। স্টেশন মাস্টারের বাড়িতে চাকরি করে বলে এইসব দোকানদাররা ফাটুকে খুব খাতির করে। বিপদ আপদে পয়সা-কড়ি দিয়েও সাহায্য করে মাঝে মাঝেই।

বৃষ্টি হলো, কিন্তু খুব সামান্য। সন্ধ্যা হবে হবে, ঠিক এমন সময় বৃষ্টি নামলো। সন্ধ্যা গাঢ় হওয়ার আগেই বৃষ্টি চলে গেলো। আকাশ যেভাবে মেঘে মেঘে কালো হয়েছিল বৃষ্টি সেই পরিমাণে হলো না। আকাশ এখনও হালকা হয়নি। মেঘ জমে আছে প্রচুর। আবারও বৃষ্টি হতে পারে, যে কোনো সময়ে।

এ ক'দিন একটানা রৌদ্র ছিল, হঠাৎ একটু বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে অসংখ্য জোনাকি উড়ছে অন্ধকারে। শিউলি তলায় একটু বেশী অন্ধকার বলে ওখানেই অজস্র জোনাকি ঝিলমিল করছে। উড়াউড়ি করছে এদিক-সেদিক। জ্বলে আর নেভে। নেভে আর জ্বলে। এই হলো জোনাকির খেলা।

এই বাড়িতে হঠাৎ আজ এতো জোনাকি উড়ছে কেন? চারুর মনে ছোট্ট একটা প্রশ্ন উঁকি দেয়। তাও আবার শিউলি তলায় জোনাকীর ভিড়। এই ভীরু জোনাকিরাও কী শিউলি ফুল ভালোবাসে? মানুষের সঙ্গে কথা না বললে একা একা কতো কী যে ভাবে। জোনাকি এক ধরনের পোকা। অন্ধকারে দেখা যায়। সেই জোনাক পোকা নিয়ে এতো ভাবছে কেন? নিজেই নিজেকে নীরবে বলে, আমি কী পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি? এসব কী ভাবছি?

যেভাবে এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার ভাবীকে ডাকতে ডাকতে এলো। এ রকম ভাবে তো অনেকেই আসবে। তাদের সবার সঙ্গেই কী মিথ্যে কথা বলবে চারু? জীবনে কখনও তো সে মিথ্যে কথা বলতে চায়নি। এখন কী শুধু তুলির কারণেই তাকে অসংখ্য মিথ্যে কথা বলতে হবে? অসম্ভব। দরকার হলে বড় একটা ছুটি নেবে। তারচেয়ে ভালো হয়, কাউকে ধরে-টরে এখান থেকে বদলী হয়ে গেলে। বাবার আমলের অনেক লোকজন এখন রেলওয়ের বড় বড় অফিসার। একটু গুছিয়ে নিজের অসুবিধার কথা বলতে পারলে তাদের সহানুভূতি অবশ্যই কাজে লাগবে।

রাত যতো বাড়ে। গভীর হয়। চারুর মনের দুঃখটাও তখন একটু বাড়ে। দু'চোখ ছলছল করে। চারু তো কোনো অন্যায় করেনি। তুলি তাকে এতো বড় একটা দুঃখ দিলো কেন? হ্যাঁ, চারুর দিক থেকে অন্যায় একটু হয়েছে। একটু বেশী বয়সে বিয়ে করেছে। মিতু-ঋতু তো এই বয়সের কথাও তাকে বলেছে। তখুনি সে মানা করতে পারতো। সেই স্বাধীনতা ছিল তার। এটাই যদি মূল কারণ হয়, তাহলে সে বিয়ে করলো কেন? বিয়েও করবে, আবার তিন দিন ঘর-সংসার করে চলেও যাবে। এটা খুব অন্যায় করেছে তুলি। চারুকে এতো বড় একটা আঘাত দেয়া উচিত হয়নি।

চারুর তুলনায় তুলির বয়সও অনেক। একজন বাঙালী মেয়ের ছাব্বিশ-সাতাশ বছর; এটাও তো বিয়ের বয়স নয়। এর অনেক আগেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। এই বয়সে তাদের ছেলেমেয়ে স্কুলে যায়। গান গায়। নাচে। কবিতা আবৃত্তি করে। বয়স একটু বেশী বলে চারুকে অবহেলা করা কী তার ঠিক হয়েছে? চারু ভদ্র ছেলে। মায়ের কথা সে মানে। তা নইলে তো চারুও প্রতিবাদ করে বলতে পারতো,

–এতো বেশী বয়সের মেয়েকে আমি বিয়ে করবো না।

ছেলেদের বয়সের কথা কেউ জিজ্ঞাসা করে না। আমাদের সমাজ সংসারে মেয়েদের বয়স নিয়েই আলাপ আলোচনা হয় বেশী। অবিবাহিত একজন যুবক, এই বয়সের একজন মেয়েকে বিয়ে করতে সহজেই রাজী হয় না। বাবা-মা কখনোই চায় না এতো বেশী বয়সের মেয়ের সঙ্গে তাদের ছেলের বিয়ে হোক। বউ মানেই অল্প বয়সের টুকটুকে একটি রাঙা বউ। এরকম ধারণাই হাজার বছর ধরে চলছে। বিয়ে বাড়িতে এই বয়সের মেয়েকেই 'কনে' হিসাবে ভালো লাগে।

আকাশে একটা তারাও নেই। আবার মেঘে মেঘে আকাশটা ভারি হয়ে আছে। যে কোনো সময় ঝমঝম করে বৃষ্টি নামতে পারে। এই অবস্থায় ছাতা ছাড়া বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাত তিনটের মেলট্রেনটা চলে আসবে। ছাতাটা বগলে নিয়ে খুব দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো স্টেশন মাস্টার। আজও দরোজাটা খোলা রেখে গেলো।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যেন ঘুমুচ্ছিলো ফাটু। স্টেশন মাস্টার একটু শব্দ করে বেরিয়ে গেছে বলেই ঘুমটা চটকে গেলো। চোখে মুখে অসহ্য বিরক্তি নিয়ে আপন মনেই বললো, সব সময় দরোজাটা খোলা রেখে যায় কেন? সাহেবের কী আশা, উনি আবার ফিরে আসবেন? যদি আসেই, উনার কাছেও তো এই দরোজার চাবি আছে। যাবার সময় তালা দিয়েই তো তালাটা ঝুলিয়ে রেখেছিলো। এ কথা কী ভুলে গেছে সাহেব। এই এক ধাক্কায়

অনেক কিছুই তো ভুলে গেছেন সাহেব। শেষ পর্যন্ত যে কি হবে কিছুই বুঝতে পারছে না ফাটু।

ক'দিন যাবত রাতে ঘুমুতে পারছে না। সারা রাত জেগে জেগে সাহেবের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। শরীরটা খুব কষে গেছে। সেই সঙ্গে মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে গেছে। নিজের ব্যাপারটা নিজেই বুঝতে পারছে ফাটু। একটা বিড়ি ধরাবে বলে যেই দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বালিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই শালা বৃষ্টিটা ঝমঝম করে নামলো। আর কী বিড়ি ধরানো যায়? দৌড়াদৌড়ি করে আশ্রয় নিতেই শরীরের অর্ধেকটাই ভিজে গেলো।

আশ্বিনে কী এইভাবে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে? আজকাল তো আবহাওয়ার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। কখন কী হয় সঠিকভাবে বলা যায় না। ওরে বাপরে, বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি। শরীরে পড়লে চড় মারার মতো ঠাস-ঠাস শব্দ হয়। তবে এই আশ্বিনের বৃষ্টি খুব ঠাণ্ডা। হিম হিম লাগে। বৃষ্টিতে ভেজা শরীর ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে।

বৃষ্টির এই ঝমঝমানি শব্দে বোঝাও গেলো না মেল ট্রেনটা কী চলে গেলো? সামান্য একটু শব্দ হয়েছিল মনে হয়, এতোটা খেয়াল করা যায়নি। এই প্রচণ্ড তোলপাড় করা বৃষ্টিতে সাহেব আসবে কী করে? বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসও আছে। ছাতাটা উলটে যাবে। সাহেবের উচিত আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আসা, তা নইলে সমস্ত শরীর ভিজে যাবে। সাহেবকে নিয়ে এসব যখন ভাবছিলো ফাটু ঠিক থকুনি মনে হলো, দৌড়াদৌড়ি করে একজন অচেনা মানুষ যেন সাহেবের ঘরে ঢুকলো। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই চেচাতে লাগলো ফাটু,

–কে? কে? ঘরে ঢুকলো কে?

এক দৌড়ে দরোজা পর্যন্ত গিয়েই থমকে দাঁড়ালো ফাটু। তার চিৎকারগুলো যেন আটকে আছে গলার কাছে। বুকের ঘড়িটা বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে। আর কোনো শব্দ বেরোচ্ছে না তার মুখ থেকে। তুলিই মুখটা ফাটুর দিকে ঘুরিয়ে বললো,

–এখনও জেগে আছো কেন? যাও ঘুমিয়ে পড়ো।

ফাটু তবু একবার তোতলার মতো বলার চেষ্টা করলো,

–আ-আ-আপনি?

–হ্যাঁ, আমি। তুমি এখন যাও।

তুলি তো জানেই চারু এখন স্টেশনে। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে বলে আসতে দেরি হচ্ছে তুলি এ কথা ভাবতে ভাবতেই দেখলো, বৃষ্টিতে ভিজেই চারু ঘরে ঢুকছে। ছাতাটা কোনো কাজে দেয়নি। ওটাকে বাইরে রেখেই ঘরে ঢুকলো। চোখ বোধ হয় ঝাপসা হয়ে গিয়েছিলো বৃষ্টির পানিতে, রুমালে মুখ টুখ মুছেই দেখলো, তুলি। তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। তুলির শরীরও বৃষ্টিতে ভেজা। কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না করেই চারু বললো,

–ভেজা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছো কেন? অসুখ করবে তো। যাও যাও, কাপড় চোপড় বদলে নাও।

এরকম কথা আশা করেনি তুলি। তুলির ধারণা ছিল, চারু ভীষণ রেগে আছে। আমাকে দেখামাত্রাই নানারকম প্রশ্ন করবে? সেসব কিছুই তো বলছে না চারু। তুলি নিজেই বললো,

–আমি তোমাকে না বলেই

–আহা, সে সমস্ত কথা এখন রাখো তো

–না না, তুমি আগে শোনো, আমি খুব

–আমি এখন কিচ্ছু শোনবো না। তুমি বৃষ্টিতে ভিজে গেছো। আগে জামা কাপড় বদলাও। তারপর কথা হবে। যাও।

তুলি বাধ্য মেয়ের মতো আলনা থেকে শুকনো শাড়ী, গামছা নিয়ে মাথা নিচু করেই বাথরুমে ঢুকলো।

এই আশ্বিনের বৃষ্টি বেশীক্ষণ থাকে না। ঝমঝম করে নামলো। কিছুক্ষণ ঝাঁপটাঝাঁপটি করে আবার হঠাৎ থেমে গেলো। আকাশ পরিষ্কার। নক্ষত্রগুলো জ্বলজ্বল করছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পরিবেশ চতুর্দিকে। কিন্তু সব কিছুই স্তব্ধ এখন। কোথাও কোনোরকম শব্দ নেই। সব যেন থেমে আছে। রাতের শেষ প্রহরে, শীত শীত এই নীল নির্জনতায় চারু আর তুলির ঘুম কেড়ে নিয়েছে। দু'জনেই শুয়ে আছে কিন্তু কারো সঙ্গে কোনো কথা বলছে না। তুলি বারবারই বলতে চেয়েছে,

–শোনো শোনো, আমার কথা তুমি শুনলেই বুঝতে পারবে।

সঙ্গে সঙ্গেই তুলিকে থামিয়ে দিয়ে চারু বলেছে,

–আমার কিছু বোঝার দরকার নেই। তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে, তুমি খুব ক্লান্ত। শুয়ে পড়ো। ঘুমাও। রেস্ট নাও।

তুলি ভেবেছিলো, ভীষণ রাগারাগি করবে চারু। ধমকাবে। ধারালো কথা বলবে। সেসব কথার কোনো জবাব দিতে পারবে না তুলি। এভাবে গভীর রাতে নিঃশব্দে চলে যাওয়া, সত্যি খুব অন্যায়। যে কোনো মেয়ে এরকম অন্যায় করলে কোনো স্বামীই তাকে ক্ষমা করবে না। এমনকি, স্বামী যদি এই কারণে ঘর থেকে বেরও করে দেয়, তবু তার কোনো প্রতিবাদ করতে পারবে না স্ত্রী। অথচ এসব কিছুই নেই চারুর ভেতরে। এ ক'দিন পর, হঠাৎ তাকে দেখে একটু আশ্চর্য হলো না চারু। যে কথাটা সবাই বলতো,

–কোথায় গিয়েছিলে?

এই সামান্য প্রশ্নটাও করলো না চারু। কেন? কেন করলো না? কেন একটু অবাক হলো না আমাকে দেখে! এ ক'দিন যে আমি ছিলাম না, আমার অভাবে কী একটুও কষ্ট পায়নি চারু। চারুর কী হৃদয় বলে কিছু নেই। তুলিতো ভেবেছিলো বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই চারু বলবে,

–তুমি চলে যাও, তোমাকে আমার দরকার নেই। তুমি কেন আবার ফিরে এসেছো?

চারু কী রকম পুরুষ? তুলি নতুন করে যেন আবার আবিষ্কার করতে চাচ্ছে চারুকে। আমাকে আবার হঠাৎ দেখে অবাক হলো না। রাগ করলো না। কিছু জানতে চাইলো না। এ রকম পরিস্থিতিতে এতো স্বাভাবিক কথা তো কেউ বলে না,

–তুমি বৃষ্টিতে ভিজে গেছো। তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় বদলাও।

হ্যাঁ, হঠাৎ বৃষ্টিতে আমি ভিজে গিয়েছিলাম। ঠাণ্ডায় আমার শরীরটা বোধ হয় কাঁপছিলো। মানলাম, আমার এমন অবস্থা দেখে এ কথা বলতেও পারে। কিন্তু আমি যখন খুব দ্রুত নিজেকে ঠিকঠাক করে আবার তার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তখনও তো কিছু জিজ্ঞাসা করলো না। প্রশ্ন করলো না আমি কোথায় গিয়েছিলাম। সে আর কোনো কথা বলছে না দেখে আমিই আবার বললাম,

–শোনো, বিশ্বাস করো, তোমাকে না বলে আমি কখনোই কোথাও ...

আমার কথাটাও শেষ করতে দেয়নি। কথার মাঝখানেই বললো,

–এখন সেসব কথা থাক। রাত প্রায় শেষ। তুমি ক্লান্ত। শুয়ে পড়ো।

এই বলে নিজেই আগে বিছানায় শুয়ে পড়লো। চোখ বুঁজে রইলো। আমি একা একা আরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। গাছের পাতা চুয়ে চুয়ে এখনও টুপটাপ শব্দে বৃষ্টির পানি পড়ছে। স্টেশনে কোনো শব্দ নেই। কয়েক মিনিটের বৃষ্টির ঝাঁপটা খেয়ে গোটা এলাকাটাই যেন থমকে আছে। এতো বেশী নির্জনতা সহ্য করতে পারিনি বলে আমিও বাধ্য হয়েছি শুয়ে পড়তে।

তুলি কিছুতেই ঘুমুতে পারছে না। ঘুমোবার চেষ্টাও করছে না। সে শুধু ভাবছে চারুকে নিয়ে। চারু কী নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক? নিষ্ঠুর হলে তো কথাই বলতো না। গলা ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিতো। ঝড় কী বৃষ্টি, এসব সে চিন্তাই করতো না। যারা নিষ্ঠুর তারা এই পরিস্থিতিতে চুলের গোছা ধরে টান মারে। চড়-থাপ্পড় দেয়। ঠোঁট কেটে রক্ত বেরোয়। কেউ কেউ লাথি মারে। আবার কেউ খুন করতেও দ্বিধাবোধ করে না। চারুর ভেতর নিষ্ঠুরতা নেই। এ রকম নিষ্ঠুরতাকে হয়তো সে ঘৃণাই করে।

কিন্তু চারু এতো স্বাভাবিক আচরণ করলো কেন? সে যা করলো কোনো পুরুষের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। চারু কী তাহলে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা বুকে চেপে রেখে তুলির সঙ্গে চরম ভদ্রতা দেখাচ্ছে? তুলি কি তার একটুও টের পাবে না? যে যতোই ভদ্রতা দেখাক, চাপা ক্রোধটা লুকাতে পারে না। চোখ দুটিতে চাপা ক্রোধের গনগনে আগুনের আঁচ থাকে। কথা বলে খুব মেপে মেপে এবং সেসব কথার গলার স্বরের ভেতরেও ক্রোধের গাম্ভীর্যতা টের পাওয়া যায়। চারু যেভাবে কথা বলেছে, তার মধ্যে ক্রোধের লেশমাত্র ছিলো না। কথাগুলোর ভেতরে অবশ্যই হৃদয়ের ছোঁয়া ছিলো কিন্তু অই মুহূর্তে অই রকম কথা আশা করেনি তুলি। শুয়ে শুয়ে চারুকে যেন টুকরো টুকরো করে অপারেশন করছে তুলি। অথচ কোথাও কোনো খুঁত খুঁজে পাচ্ছে না।

চারু কী ঘুমুচ্ছে? ওপাশ ফিরেই অনুভব করার চেষ্টা করলো তুলি। ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ হয় অন্যরকম। আর যারা ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে, তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ আরেক রকম। চারু নিঃশব্দে শুয়ে আছে। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো হেরফের নেই। ঘুমুচ্ছে কী ঘুমুচ্ছে না, বারবার চেষ্টা করেও কিছু বুঝতে পারলো না তুলি। বৃষ্টি বেশিক্ষণ ছিলো না। কিন্তু যতোক্ষণ ছিলো, দশ দিক তছনছ করে থেমে গেছে। জায়গায় জায়গায় জল জমে আছে এখনও। সঙ্গে ঝড়ো বাতাস ছিলো বলে গাছপালার অসংখ্য সবুজ-সতেজ পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে রাস্তায়-ঘাটে ফেলে রেখে গেছে। নড়বড়ে দুর্বল ঘর-বাড়ির বেশ ক্ষতি হয়েছে। দু'চারটে ভেঙেও পড়েছে মাটিতে!

খুব ভোরবেলায় শিউলি তলায় এসে থমকে দাঁড়ালো চারু। ঝড়-বৃষ্টি শিউলি গাছটাকেই যেন দুমড়ে মুচড়ে টেনেটুনে ছিন্ন ভিন্ন করে গেছে। ফুলগুলো সব ঝরে গিয়ে ভেজা ঘাসের উপর ছেঁড়া ছেঁড়া বিবর্ণ হয়ে পড়ে আছে। চারুর মনে হচ্ছে, অনেকগুলো দুঃখ যেমন হৃদয়ের ভেতর পড়ে থাকে নিশ্চুপ হয়ে। এখন ঠিক সেইরকম লাগছে বিবর্ণ ফুলগুলোকে।

এতো ভোরে কখনও ঘুম ভাঙে না চারুর। এখানকার চাকরির জীবনে আজকেই প্রথম সে খুব ভোরের বেলায় হেঁটে হেঁটে চারদিক দেখছে। আকাশটা খুব পরিষ্কার। একটু পরেই সোনালী আভা ছড়িয়ে রোদ উঠবে। পাখিরাও বুঝতে পেরেছে দিনের অবস্থা। এখুনি কিচির মিচির শুরু করেছে ডালে। উড়াউড়ি করছে এ গাছ থেকে ও গাছে। বাড়িতে ঢুকতেই, এতো ভোরবেলায় সাহেবকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ালো মেন্দী। তারপর খুব দ্রুত মাথার ঘোমটাটা আরেকটু বাড়িয়ে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো।

চারু ভাবছিলো, মেন্দী মেয়েটাকে কিছু বলবে। তারপর মনে হলো, যাক ফাটু আসুক, ফাটু কোনোদিন মেন্দীর আগে আসতে পারে না ভোরবেলায়। আজকে ফাটুও এলো খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু অই একই অবস্থা। সাহেবকে এতো ভোরবেলায় দেখে হা হয়ে গেলো। আর যেন এগোতে পারছে না ফাটু। থ হয়ে আছে।

সাহেব তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। এই সাত সকালে ফাটুর বুকটা ঢিব ঢিব করে উঠলো।

সাহেব খুব আস্তে করে বললো,

–ফাটু, রাতে কী দেখেছিস?

–উনি ফিরা আসছেন!

–এ কথা কী কাউকে বলার দরকার আছে?

–জেনা।

–তোরা দু'জন, উনাকে কখনও জিজ্ঞাসা করবি না, উনি কোথায় গিয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করবি? জেনা সাব, জেনা।

–মেন্দীকেও কথাটা জানিয়ে দিবি।

এই বলেই বাইরে চলে গেলেন স্টেশন মাস্টার। এদিকে ফাটু এক দৌড়ে ঢুকে পড়লো রান্নাঘরে।

চমকে উঠলো মেন্দী মেয়েটা।

–কী অইছে।

–বেগম সাব ফিরা আইছে!

–কস কী, কহন আইছে?

–রাইতে, ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কিন্তু কথা আছে।

–কী কথা?

আরেকটু কাছে গিয়ে, সাহেবের সাবধান বাণীগুলো ফিসফাস করে মেন্দীকে জানালো ফাটু। মেন্দী হা হয়ে রইলো ফাটুর দিকে। নীরবেই মেন্দীর ঘোমটাটা খসে পড়লো বিনা বাতাসেই।

পাঁচ

সকাল দশটার ঘুম থেকে উঠে নিজেই অবাক হয়ে গেলো তুলি। আমি ততোক্ষণ ঘুমালাম? বাইরে কী ঝকঝকা রোদ। তাকানো যায় না। চোখে লাগে। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে, আমি কখন ঘুমিয়েছিলাম? আমারতো কিছুতেই ঘুম আসছিল না। চারুকে নিয়ে ভাবতে ভাবতেই মেজাজটা বিগড়ে যাচ্ছিলো। বৃষ্টিতে বাইরে খুব ঠাণ্ডা ছিল। একটু একটু করে শীত লাগছিলো হাতে পায়ে। চারু তার পাশেই ঘুমুচ্ছে। ঘুমন্ত চারুকে দেখে, ভেতরের রাগটা আরও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। মনে হচ্ছিলো, চারুর মতো নির্দয় মানুষ পৃথিবীতে নেই। আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম, একথা সত্যি। চারুতো আমাকে ঘুমোবার জন্য একটু সান্ত্বনাও দিতে পারতো। স্বার্থপরের মতো একাই ঘুমুচ্ছে। সারাক্ষণ তো এসবই ভাবছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম? কিছুতেই ঘুমোবার সময়টাকে চিহ্নিত করতে পারছে না তুলি।

বিছানা থেকে উঠে পড়লো খুব তাড়াতাড়ি। নিজেকেই নিজে ধিককার দিতে লাগলো। ছি ছি, এতো বেলা পর্যন্ত দাঁতে রোদ লাগিয়ে কেউ ঘুমোয়? চারুতো নিশ্চয়ই দেখেছে আমি ঘুমে বিভোর। সেও তো আমাকে ডাকতে পারতো। হঠাৎ মনে হলো, চারু কী ইচ্ছে করেই আমাকে ডাকেনি? কেন? চারু কী আমার সঙ্গে আর কথা বলতে চায় না। যতো কম কথা বলে দূরে দূরে থাকা যায়, এই নীতিই অনুসরণ করে চলছে নাকি? এই সংসারে আবার ফিরে এসে আমি কী ভুল করলাম।

শিউলি তলায় এসে বিবর্ণ ফুলগুলোর অবস্থা দেখে খুব খারাপ লাগলো তুলির। ওখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো নীরবে। হঠাৎ মেন্দী মেয়েটাকে দেখে যেন ধ্যান ভাঙলো। কিন্তু কী বলবে না বলবে তার কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না তুলি। মেয়েটাও হা করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মনে হচ্ছে, খুব গভীরভাবে কি যেন দেখছে। হঠাৎ করেই শব্দটা বেরিয়ে গেলো মুখ থেকে,

– কি দেখছিস?

মেন্দী খুব চালাক চতুর মেয়ে। একটু হেসেই বললো,

– আপনি ভালো আছেন?

– কেন? কী শুনেছিস? আমি খুব অসুস্থ?

– বালাই ষাইট, কে কয় আপনি অসুস্থ

– বাহ্ আমি যে ক'দিন ছিলাম না, এই নিয়ে কেউ কিছু বলেনি?

– কে কই বো?

– কেন, তোদের সাহেব?

মুখের হাসি আরেকটু বাড়িয়ে দিয়ে মেন্দী বলে

– আপনে যে কী কন, সাহেব কী আমগো সঙ্গে কথাবার্তা কয়?

– কিচ্ছু বলেনি?

– না। এই কয়দিনত সাইবের মুখে কথাই ছিল না। নীরবেই আসতো। ঘরের মধ্যেও চুপচাপ থাকতো। আবার নীরবেই বাইর অইয়া যাইতো!

– তাই?

– হা সায়েব কোনো কথাই কইতোনা!

আমার অভাবেই চারু যদি নীরব হয়ে থাকে, তাহলে আমি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তো মুখে খই ফোটার মতো অজস্র কথা বলতে পারতো। বললোনা কেন? কী হয়েছে চারুর। ও এমন করছে কেন? নিজেও বেশী কথা বলছে না। আর আমি বলতে চাইলেও বাধা দিচ্ছে। কোনো কিছুই শুনতে চাচ্ছে না। ওরই তো জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। গত পাঁচ দিন আমি কোথায় ছিলাম। কাউকে কিছু না বলে, এতো গভীর রাতে আমি নিঃশব্দে চলে গিয়েছিলাম কেন? এসব নিয়েই তো সে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে। স্বামী হিসাবে এই অধিকারতো শুধু তারই আছে। আমি ফিরে আসার পরও চারু এতো নীরব কেন? এই প্রশ্নটাই এখন খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তুলির মনে।

চারু এখন কোথায়। এই সময়ে তো সে স্টেশনে যায় না কখনও। সারা বাড়ির এদিকে সেদিক তন্ন তন্ন করে খোঁজে, কোথাও চারুকে না দেখে, সাপের মতো ফণা তোলে যেন ফুস ফুস করছে একা একাই। এই অবস্থায় ফাটু তার সামনে পড়ে, ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। তুলির প্রশ্ন,

–তোমার সাহেব কোথায়?

–ইস্টিশনে।

–কি করছে?

–ঢাকার হেড অফিসে টেলিফোনে কথা কইতাছে।

–ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই তুলি অন্য প্রসঙ্গ তোলে।

–আমি কোথায় গিয়েছিলাম, জানো।

– জেনা

–তোমার সাহেব কিছু বলেনি

– জেনা,

–আশ্চার্য। আমি যখন যাই, তখন তোমার সাহেব ছিল ঢাকায়। ফিরে এসে যখন দেখলো দরোজায় তালা ঝুলছে, তখনও কিছু বলেনি তোমাদেরকে!

– সাহেব আইছে রাইতে, আমরাতো তহন ছিলাম না।

– পরের দিনও কিছু জিজ্ঞাসা করেনি।

– জেনা?

– আমি যে নেই, এই নিয়ে তুমিও কিছু সাহেবকে বলোনি

– জেনা। আমরা কাজের লোক, সাহেবের বেগম সাহেবার কথা জিজ্ঞাসা করমু, এতোবড় সাহস তো আল্লায় আমগো দেয় নাই।

–আশ্চর্য, আমি যদি কোথাও এ্যাকসিড্যান্ট করি, মরে যাই, তবু কিছু জিজ্ঞাসা করবে না সাহেবকে?

এখন আর কোনো উত্তর দেয় না ফাটু। মাথা নিচু করেই দাঁড়িয়ে থাকে। রাগে হন হন করে ফাটুর সামনে থেকে চলে যায় তুলি। এতোক্ষণ ফাটুর যেন দম আটকানো অবস্থা ছিল। এইমাত্র জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে এক দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢক ঢক করে পানি খেলো ইচ্ছা মতো। ওর এই অবস্থা দেখে মেন্দী মেয়েটা জিজ্ঞেস করে,

–কী অইছে? এইভাবে পানি খাইতাছো ক্য

–বিপদে পড়ছিলাম। আল্লায় উদ্ধার করছে।

কথা বলার সময়, ইশারায় নতুন বউকে শনাক্ত করে। মেন্দী যেন সহজেই বুঝতে পারে তার বিপদের কথা। অপেক্ষা করতে করতে ভীষণভাবে রেগে যাচ্ছে তুলি। একবার ভেবেছিলো স্টেশনেই যাই। ডেকে নিয়ে আসি। ভুলতো একটা হয়েছেই। এই দিন-দুপুর সবার সামনে স্টেশনে গেলে, আরও একটা ভুল হবে। এই মনে করে সে আর স্টেশনে গেলো না। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে, ঝলমলে রোদে তা টের পাওয়া যাচ্ছে না। এখনও যখন চারু এলো না। শেষ বিকেলের মেল ট্রেনটা না যাওয়া পর্যন্ত সে আসতে পারবে না, তারপর সে যখন আসবে, তখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

জেদ করেই একা একাই খেতে বসলো তুলি। কী খাচ্ছে না খাচ্ছে বলতে পারছে না। রাগে তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এ শরীরের সব রক্ত যেন মাথায় উঠেছে। কপালের দুটো রগ দপদপ করছে। কোনো মতে খাবারটা খেয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। বার বার শুধু মনে হতে লাগলো, চারুকে না বলে যাওয়ায় সে তার ভুলের মাশুল দিচ্ছে প্রতিমুহূর্তে।

– এই অসময়ে ঘুমচ্ছো কেন?

চারুর কন্ঠ শোনে চমকে উঠলো তুলি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চারিদিকে এখন অন্ধকার। ঘুম জড়ানো চোখে একবার চারুকে দেখে,আবার শুয়ে পড়লো তুলি। শরীরটা ভাঁজ করে, মুখটা বালিশে গুঁজে পড়ে রইলো বিছানায়। আবার বললো চারু,

– কী বললাম, শুনতে পাওনি? সন্ধ্যা বেলায় ঘুমানো খুব খারাপ?

– জানি।

– তারপরও শুয়ে থাকবে?

– হ্যা। আমার ইচ্ছে আমি শুয়ে থাকবো।

চারু বুঝতে পারলো, এসব রাগের কথা। তারপরও যদি কথা বলে, তুলির রাগ আরও বাড়বে। এখন আর দরকার নেই কোনো কথা বলার। এই ধরনের রাগারাগি ভালো লাগে না চারুর। হাত মুখ ধুয়ে, কাপড় চোপড় বদল করে, নীরবেই সে আবার বাইরে বেরিয়ে গেলো।

তুলি ঘুমায়নি। মাথা গুঁজে ও ভাবছিলো, চারু তখখুনি তাকে টেনে তুলবে। দুপুরে আসতে পারেনি বলে ক্ষমা চাইবে জোড় হাত করে। তারপর খুব কাতর কণ্ঠে বলবে,

– তুলি, প্লিজ! আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে। কিছু একটা খেতে দাও!

বাথরুমে হাত মুখ ধোয়ার জলের শব্দ পেয়ে ভেবেছে, সারাদিন কাজ কর্মে ব্যস্ত ছিল। এখন খুব ক্লান্ত। মুখে চোখে পানি দিয়ে, নিজেকে একটু সতেজ করে, তারপর তার কাছে এসেই জ্বালাতন শুরু করবে।

অনেক্ষণ আর কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে, এইবার মুখ তুললো তুলি। আস্তে আস্তে উঠে বসলো। চারু কোথায়? আবার কোথায় গেলো। বাইরে এসেও যখন চারুর সন্ধান পেলো না তখন সত্যি সত্যি মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো তুলির। ভেতরে ভেতরে যতো রাগ ছিলো, এই মহূর্তে সব যেন সহানুভূতির বৃষ্টিতে ভিজে গেলো। সারাদিন পরিশ্রম করে মানুষটা ঘরে এলো। ডাকলো। তবু কেন উঠলো না সে। তুলি খুব ভালোভাবেই জানে, চারু কখনও স্টেশনের কিছু খায় না। ওর সহ্য হয় না। শুধু চা খায় বার বার। ডিউটি শেষে বাড়িতে এসেই খাবার খায়।

কিছুক্ষণ আগেই খুব ক্ষুধা নিয়ে এসেছিলো বোধহয়। এই সময়ে এতো জেদ করে শুয়ে থাকা খুব অন্যায় হয়েছে তুলির। বুক বোঝাই অনুতাপ নিয়ে তুলি এখন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। তুলির চোখ দুটো কী টলমল করছে? অন্ধকারে তা বোঝা যাচ্ছে না।

চারু বাড়ি ফিরলো অনেক রাতে। ঘরে ঢোকার আগেই দেখলো কে যেন শিউলি তলার অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। চারু একটু উঁচু গলাতেই জিজ্ঞেস করলো– কে ওখানে?

ছায়ামূর্তি কোনো উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে চারুর কাছে এসে দাঁড়ালো। চারু তুলিকে দেখেই অবাক হয়ে বললো,

– তোমাকে না বলেছি অন্ধকারে শিউলি তলায় যেও না। ফুলের গন্ধে সাপ টাপ আসতে পারে?

কথার কোনো উত্তর না দিয়ে তুলি ঘরে চলে গেলো। একটু পর, চারু ঘরের ভেতরে গিয়ে জামা খুলছে। ঠিক সেই মহূর্তে তুলি বললো,

– কোথায় গিয়েছিলে?

চারু চট করে একবার তুলিকে দেখে নিলো। কথার কোনো জবাব না দিয়ে শার্টটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে লুঙ্গিটা পরে যখন বিছানার এক পাশে এসে বসলো, তখন আবার একই প্রশ্ন করলো তুলি,

– কোথায় গিয়েছিলে?

এবার নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলো না চারু। পাল্টা প্রশ্ন করলো তুলিকে,

– তুমি কোথায় গিয়েছিলে, আমি কি কখনও তা জিজ্ঞেস করেছি?

তুলি বলতে চেয়েছিলো, আমি তো সে কথা বারবার বলতে চাচ্ছি। তুমিই তো শুনতে চাচ্ছো না। কিন্তু বললো না। তুলি ভাবলো, এখন সেসব কথা বলতে গেলেই দু'জনার ঝগড়া বাঁধবে। এই ঝগড়ার ফলাফল খুব খারাপ হবে। দু'জনার সম্পর্কে ফাটল ধরবে। তার চেয়ে এখন চুপ থাকাই ভালো।

কেউ আর কোনো কথা বললো না। বিছানার দু'দিকেই দু'জন বসে রইলো অনেকক্ষণ। টেবিলে রাতের খাবার সাজানো ছিলো। চারু একটা কথা বললো, কিন্তু কাকে বললো তা ঠিক বোঝা গেলো না। কথাটা হলো,

– খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

এই বলেই চারু খেতে বসলো। একা একাই খেয়ে নিলো। তারপর শুয়ে পড়লো বিছানায়। খাবারগুলো ঢেকে

রেখে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলো তুলি এবং অন্ধকারেই ঢকঢক শব্দ করে শুধু পানি খেলো। মনে হলো, তুলির যেন ইচ্ছে করেই চারুকে শোনানোর জন্যই পানি খাওয়ার ঢক ঢক শব্দটা করেছে।

বাইরের জগৎটা গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত। দশ দিকেই সীমাহীন স্তব্ধতা। আকাশ যেমন বুক ভরা অসংখ্য নক্ষত্রের মতো কথা নিয়ে চুপ করে আছে। ঘরের ভেতরে এদের দু'জনার অবস্থাও অনেকটা সেই রকম। দু'জন দু'দিকে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। কারোর চোখেই ঘুম নেই। বুক ভরা কথা আছে অনেক। অসংখ্য কথা। কিন্তু কেউ কাউকে কিছুই বলছে না। এখনকার কথাগুলো আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো। একজন বললেই সে কথা আরেকজনের মনে আগুন জ্বালাবে। তার চেয়ে চুপ থাকাই ভালো।

চারু খুব ক্লান্ত ছিল। এক সময় গভীর ঘুমের ভেতর তলিয়ে গেলো, কিন্তু ঘুমুতে পারছে না তুলি। ছটফট করছে। মাঝে মাঝে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। ভীষণ বড় একটা যন্ত্রণা খচ্ খচ্ করছে তার মনের ভেতরেই। ভাবতে ভাবতে এক জায়গায় এসে থেমে পড়লো তুলি। মনে হলো, গত কয়েক দিন ধরেই সে যেন একটা ভুল ট্রেনে জার্নি করছিলো। কোথাও কোনো চারুর দোষ খুঁজে পেলো না। সব দোষ তুলির নিজের। স্বামী বাড়ি নেই। ঢাকায় গেছে অফিসিয়াল কাজে সেই সুযোগে, ঘরের নতুন বউ যদি কাউকে না জানিয়ে গভীর রাতে বাড়ি থেকে উধাও হয়; ভীষণ বড় একটা হৈচৈ হয়ে যাওয়ার কথা। এক দু'দিন নয়, পাঁচদিন পাঁচ রাত। অন্য কোনো স্বামী হলে, থানায় যেতো। ডায়রী করতো। আত্মীয় স্বজনকে খবর দিতো। হারিয়ে গেছে না খুন হয়েছে। নাকি বিয়ের আগে থেকেই কারোর সঙ্গে ভালোবাসা ছিল, এই সুযোগে পালিয়ে গেছে। এসব নিয়ে জল্পনা কল্পনার অন্ত থাকতো না। ছি ছি ঢিঢি পড়ে যেতো চতুর্দিকে।

চারুর কী অসীম সহ্য শক্তি। এই নিয়ে সে কোনো টু-শব্দ করেনি। কাউকেই ব্যাপারটা জানায়নি। নিজের মার কাছেও কোনো রকম খবর দেয়নি। স্টেশনের কাউকেতো কিছু বলেইনি। বরং বাড়ির দু'টি কাজের মানুষ, যারা সব কিছুই নিজের চোখে দেখছে। তাদের কাছেও গোপন রেখেছে ব্যাপারটা। কী সাংঘাতিক ধৈর্য্যের মানুষ। সারারাত ভাবতে ভাবতে চারুর প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেলো তুলির।

নিজের কাছেই নিজেকে খুব বাজে মেয়ে মনে হলো। এতো বড় একটা ঘটনার জন্ম দিয়েও এখনও সে আজেবাজে ব্যবহার করছে চারুর সঙ্গে। যখন তখন রেগে যাচ্ছে। কথা বলছে না। দূরে দূরে থাকছে। চারু যদি এসব নিয়ে মুখ খুলতো, তুলি তার এই মুখ কোনো দিন কাউকে দেখাতে পারতো না। কলঙ্কিনী দ্বিচারিণী বলে চতুর্দিকের মানুষ তাকে দেখেই থু থু ফেলতো। লজ্জায় ঘৃণায় নিজের যে এমন অবস্থা হতো, সেসব কল্পনা করলেও তুলির সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠে এখন।

সারারাত আর ঘুম হলো না তুলির। চেয়ে থাকতে থাকতেই অন্ধকার রাত্রিটা ভোর হয়ে গেলো চোখের সামনেই। বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। দু'চারটে পাখি বাড়ির গাছে গাছে এসে যেন ডাকাডাকি করছে। এই পবিত্র ভোর বেলাটাকে ছুঁয়ে যেন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো তুলি, সে আর কখনও কষ্ট দেবে না চারুকে।

সাত সকালের ছোট ছোট বাতাসে, আস্তে আস্তে সারাবাড়ি হেঁটে বেড়াচ্ছে তুলি। বাড়ির চতুর্দিকেই শিউলি ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে আছে। ভোরের পাখিরা কী আজ টের পেয়েছে, বাড়ির বউ ফিরে এসেছে বাড়িতে। নিশ্চয়ই টের পেয়েছে, তা না হলে এতো কিচির মিচির করবে কেন? এসব ভাবছে, আর একা একাই নিঃশব্দে মিট মিট করে হাসছে তুলি। মেন্দী খুব তাড়াহুড়ো করে বাড়িতে ঢুকতেই তুলি ডাক দিলো,

– মেন্দী

মেন্দী খুব দ্রুত তুলির কাছে এসে বসলো আড়ষ্ট গলায়

– জি

– তুই সব আয়োজন কর, নাশতা আমি নিজের হাতে তৈরী করবো।

– জি আচ্ছা।

এই বলেই ঘুটঘাট করে তালা খুলে রান্নাঘরে ঢুকলো মেন্দী। তুলি ভাবলো, একটু পরেই রোদ ছড়িয়ে পড়বে চতুর্দিকে। ভোরের এই হাওয়াগুলো খুব ভালো। বিশুদ্ধ। শরীরে লাগলে গোটা শরীরটাই খুব সতেজ মনে হয়। চারুকে কী ডাক দেবে? চারু তখনও গভীর ঘুমে। থাক, অনেক দিন ওর ভালো ঘুম হয়নি। আজ যতোক্ষণ পারে ঘুমুক।

সকাল সাতটা পর্যন্ত ভোরের আমেজ থাকে। এরপর রোদে রোদে, মানুষের কোলাহলে সব নষ্ট হয়ে যায়। দিনটা তার সমস্ত স্নিগ্ধতা হারিয়ে ফেলে। এই ভোরের আমেজ থাকতে থাকতেই চারুকে ঘুম থেকে উঠাতে হবে।

একটু দূর থেকে, এক মুঠো শিউলি ছুঁড়ে মারলো ঘুমন্ত চারুর মুখে। ফুলের আঘাতে কী এতো গভীর ঘুম ভাঙে? ভাঙলোনা। হঠাৎ একটা দুষ্ট বুদ্ধি ঝিলমিল করে উঠলো তুলির মাথায়। তুলি খুব সন্তর্পণে দুটি শিউলি ফুল আস্তে করে গুঁজে দিলো নাকের ফুটোয়। সঙ্গে সঙ্গেই চারুর মুখটা নড়ে উঠলো। দম নিয়ে একটু অসুবিধা হয়েছিল কি? খুব আস্তেই চারু চোখ দুটো খুলে চার পাশ দেখার আগেই আরও এক মুঠো শিউলি ছুঁড়ে মারলো মুখে। কাচা ঘুম ভাঙার অশ্বস্তি তো নেই-ই। চোখ খুলে আর বুঁজে– এই অবস্থাতেই ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে মিট মিট করে হাসছিলো চারু। তুলিকে স্পষ্টভাবে না দেখেও চারু বুঝতে পারছে তুলিই দুষ্টুমী করছে। আজ সকাল বেলা চোখ খুলেই হাসতে হাসতে বিছানায় উঠে বসলো চারু। মুগ্ধ নয়নে তুলির দিকে তাকিয়ে বললো,

– সুপ্রভাত।

খুব গিন্নী গিন্নী ভাব নিয়ে তুলি তার উত্তর দিলো

– এখন আর প্রভাত নেই। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো। আমি নাশতা নিয়ে আসছি। বেশ কয়েক দিন পর, জীবনের সুখ সুখ ভাবটা যেন আবার ফিরে পেলো চারু। শরীরটা খুব হালকা হালকা লাগছে। হৃদয়ে আর মেঘ নেই। আশ্বিনের এই আকাশটার মতই ঝকমকে পরিষ্কার মনে হচ্ছে। নাশতা খেতে খেতে আজ নয়ন ভরে দেখছে তুলিকে। তুলিও তার ডাগর ডাগর চোখ পাকিয়ে বলছে,

– এই! এইভাবে কী দেখছো? আমি কি নতুন?

– নতুনই তো। একদম টাটকা। ফ্রেশ!

– যাহ্!

দু'জনেই হেসে উঠলো। হাসতে হাসতেই তাদের নাশতা খাওয়া শেষ হলো। টাওয়ালে হাত মুছতে মুছতেই চারু লক্ষ্য করলো, বাইরে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে ফাটু। চারু খুব হাসিখুশী মন নিয়ে বললো,

– ফাটু, কিছু বলবি?

মাথা চুলকাতে চুলকাতে ফাটু বললো,

– বেলা অইয়া যাইতেছে তো, বাজারে যাইতে অইবো,

– কি আনতে হবে, তুই এদিকে আয়

তুলি চট করে বলে উঠলো

– না না, তুই ওখানেই থাক আমি আসছি। ফাটু আসতে গিয়েও বেগম সাহেবার কথা শুনে আবার দাঁড়িয়ে পড়লো। এদিকে ইশারায় তুলি চারুকে আসতে বললো, চারু কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তুলি ফিসফিস করে কানে কানে বললো,

– জীবনে আর এই ভুল করবে না। বাইরের মানুষকে কখনই আমাদের বেডরুমে ঢোকাবে না। মনে থাকবে?

– থাকবে।

– আজ এখানকার হাটবার না?

– হ্যা

– অনেক কিছুই আনতে হবে। টাকা আমার কাছে দাও।

সামনেই দুর্গাপূজা। তিন চারদিন পরেই শুরু হবে ঢাকের বাজনা। পূজা প্যান্ডেলগুলোর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ। বিসর্জনের পরে আর কেউ ইলিশ মাছ খায় না। ভালোও লাগে না। এইসব ভেবে ডিম ছাড়া দুটো বড় বড় পদ্মার ইলিশ মাছ কিনলো ফাটু। স্টেশন মাস্টারের বাড়িতে থাকে বলে বাজারে সবাই ফাটুকে চেনে। ভালো জিনিস সেধে সেধেই দেয়। দামও একটু কম রাখে। কখনও কোনো জিনিস বাকি চাইলেও মানা করে না। ছোট্ট শহরতো। স্টেশন মাস্টার তো এদিকে কখনও আসে না। সেই জন্যে ফাটুকে আরও খাতির সমাদর বেশী করে। হঠাৎ কারো টিকেটের প্রয়োজন হলে ফাটু মিয়াই তা ম্যানেজ করে দেয়। বড় বড় অফিসার আর এই শহরের ধনী লোকগুলো বাদে সবাই ফাটুর কাছেই যায়। সমস্যার কথা ফাটুকেই বলে।

আজকাল আর হাটবার বলতে তেমন কিছু বোঝায় না। চারদিকেই গিজ গিজ করে মানুষ। আশে পাশেও অনেক বাজার বসেছে। আগে যেমন হাটবার বলতেই দূর দূর থেকে কৃষকেরা আসতো ক্ষেতের সমস্ত টাটকা জিনিস নিয়ে। এখনও আসে কিন্তু প্রতিদিনই এই শহরের বাজারে আসে। সকাল বিকেল দু'বেলায় তাদের টাটকা জিনিস পাওয়া যায়। হাটবার বলে এখন আর কিছু নেই। এই শহরে এখন প্রতিদিনই দু'বেলায় হাট বসে। সপ্তাহের সব দিনই এখন হাটবার। বাজার নিয়ে স্টেশন কোয়ার্টারে যেতে যেতে ফাটু ভাবলো, এই হাটবারের বিষয়টাকে ভালোভাবে বোঝাতে হবে বেগম সাহেবাকে। দুপুর দুটোর দিকেই চারু চলে আসবে। ওরা দু'জনেই একসঙ্গে খাবে। কিন্তু এখনও তো আসছে না চারু। এতো দেরী করছে কেন? ফাটুকে স্টেশনে পাঠালো তুলি।

দু'জন ভদ্রলোক খুব অনুরোধ করছে স্টেশন মাস্টারকে। যে করেই হোক ঢাকায় আজ তাদেরকে ফিরতেই হবে। দুটো ফাস্টক্লাস টিকেটের ব্যবস্থা করে দিলে তারা খুব কৃতজ্ঞ থাকবে। স্টেশন মাস্টার তাদের দু'জনকে সব খুলে বলছে,

– দেখুন। ফাস্ট ক্লাসের টিকেট আমরা ইচ্ছে মতো বিক্রী করতে পারি না। আমাদের এই জামালপুর স্টেশনের জন্য একটা কোটা নির্ধারিত আছে। বাহাদুরাবাদ ঘাট থেকেই ফাস্ট ক্লাসের টিকেট বিক্রী হয়ে যায়। আমাদের কোটা মাত্র আটজনের। এই টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে দু'দিন আগেই। আমি আপনাদেরকে টিকিট দেবো কোত্থেকে? আমাদের ডিসি সাহেব তার ফ্যামেলি নিয়ে আজ ঢাকায় যাবেন। তিনিও গতকাল আমাকে টেলিফোন করেই জানিয়ে দিয়েছেন। তারা হলেন ভিআইপি। যে কোন সময় যেতে চাইলে, যেভাবেই হোক আমাদেরকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বর্তমান ডিসি সাহেব খুব ভালো লোক। উনি আমাদের এই ফাস্টক্লাস টিকেটের জটিলতা জানেন বলে গতকালই আমাকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন। সরি, আমি আজ আপনাদের কোনো উপকার করতে পারবো না।

তারপরও ভদ্রলোক দু'জন দাঁড়িয়ে আছেন। এতো কিছু বলার পর, আবারও অনুরোধ করছেন। এইবার একটু রেগেই বললেন, স্টেশন মাস্টার,

– সরি, আই এম সরি। আমাকে কাজ করতে দিন।

তবু ভদ্রলোক দু'জন সরছে না। এর মধ্যে ফাটু কী করে বেগম সাহেবার কথা বলবে, তার কোনো ফাঁক ফোকর পাচ্ছে না। স্টেশন মাস্টারের চোখ যেন চারটে। ফাটুকে কখন দেখেছে ফাটু তা নিজেই বুঝতে পারছে না। ফাটুকে স্টেশন মাস্টার কাজ করতে করতেই বললো, আমি এখন যেতে পারবো না। তোরা খেয়ে নে।

আকারে ইংগিতে বললেও ফাটুর বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। অনেক দিন যাবত এই মাস্টার সাহেবের সঙ্গে আছে। মাস্টার সাহেব শুধু অ বললেই আটুকু বুঝে নেয় ফাটু। তোরা খেয়ে নে মানে বেগম সাহেবাকে খেয়ে নিতে বলো। ফাটু আরও ব্যাখ্যা দিয়ে বললো বেগম সাহেবাকে,

– আমগো ডিসিসাব ঢাকায় যাবে ফেমিলি নিয়া, তারে বিদায় না করে সাহেব আসতে পারবে না। আপনেরে খাইয়া নিতে কইছে।

এই বলে আর এক মহূর্তও দাঁড়ালো না ফাটু। একেতো বেগম সাহেবা নতুন। কখন কী বলে বোঝা মুস্কিল। তারপরও বোঝাতে চাইলো, 'আমিও খাইতে পারমুনা' ইস্টিশনে আইজ বড় ঝামেলা, সাহেবের কাছেই থাততে অইবো আমার।

এভাবে বলে যাওয়ার পেছনে কারণ আরও আছে। সাহেবের উপর যেন রাগ না করে। সাহেব সত্যি সত্যি ব্যস্ত আজ। ফাটুর কী, ফাটুর তো কোনো অসুবিধা নেই। স্টেশনে হোটেল আছে। অই হোটেলেও খেয়ে নিতে পারে। ওরা ফাটুর কাছ থেকে টাকা পয়সা নেয় না।

গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী করতো তুলি। গোসল-খাওয়াটা সে সময় মতই সেরে নেয়, বিয়ের পর একটু অনিয়ম হচ্ছে। প্রথম প্রথমতো, আস্তে আস্তে সব নিয়মের মধ্যে এসে যাবে। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে ক্ষুধাও লেগেছে ভীষণ। ইচ্ছা না থাকলেও খেয়ে নিতে হলো তুলিকে। একবার মনে হয়েছিল, ওতো স্টেশনের কিছু খায় না। সামান্য কিছু পাঠিয়ে দেই, নাশতা করুক। কিন্তু কোনো লাভ নেই। পাঠালেও সে খাওয়ার সময় পায় না। শেষ পর্যন্ত বাড়ির জিনিস বাড়িতেই ফিরে আসে ঠান্ডা হয়ে।

আজকের বিকেলটাও খুব মায়াময়। শেষ বিকেলের আলোয় পৃথিবীটাকে হলুদ হলুদ কনে বউয়ের মতো লাগছে। একটু পরেই গোধুলির ঘোমটা টেনে, চলে যাবে দূরের যাত্রায় তাকে বিদায় দিয়ে এখানে অন্ধকার জমে উঠবে ধীরে ধীরে।

গভীর রাতে চারুর বুকে মুখ রাখলো তুলি। চারু তার আঙুলগুলো নাড়তে লাগলো, তুলির মাথা বোঝাই গভীর চুলে। যেন বিলি কাটছে চারু। এই আদর পেয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে যাবে তুলি। অনেকক্ষণ যাবত কেউ কিছু বলছে না। টুপটাপ করে শিশির ঝরে পড়ার মতো শব্দে তুলি বললো,

– একটা কথা বলবো?

– বলো

– তুমি রাগ করবে না তো?

– না না, বলো

– তুমি জানো, আমি কতো বিপদে পড়ে, সেদিন গভীর রাতে.......

কথাটা শেষ করতে দিলো না চারু। খুব দ্রুত বুক থেকে তুলির মুখটা সরিয়ে দিয়ে ঝট করে উঠে বসলো চারু। এক মুহূর্তেই যেন বুদ্ধিসুদ্ধি সব হারিয়ে ফেললো তুলি। অবাক হয়ে গেলো চারুর অস্থিরতা দেখে। চারু বললো,

– সে সব কথা বলার সময় কী এখন?

খুব জড়োসড়ো আড়ষ্ট গলায় তুলি বললো,

– তাহলে কখন বলবো?

– বলার কী দরকার। আমিতো কখনোই শুনতে চাচ্ছি না সে সব কথা।

এই মুহূর্তে চারুকে খুব নিষ্ঠুর মনে হলো তুলির।

তুলি একবার ভেবেছিলো, বিয়েই করবে না জীবনে। এই প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারী করেই জীবনটা শেষ করে দিবে। এই সমাজে মেয়ে জন্মানোই ঝামেলা। বাবা কিম্বা আত্মীয়-স্বজনরা যখন সংবাদ পায় মেয়ে হয়েছে তখন কেউই খুশী হয় না। তাদের ভাবসাব দেখে মনে হয়, বাড়িতে একটা বিপদ এলো। বড় করে বিয়ে শাদী না দেয়া পর্যন্ত এ বিপদ থেকে কারো মুক্তি নেই।

শুধু বিপদ নয়, আজকাল মহাবিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। এই তুলিকে নিয়েও বাবা মা খুব বিপদে ছিল। তুলিতো দেখতে খুবই সুন্দরী। স্বাস্থ্যও চমৎকার। দোহারা গড়ন। যে কোনো পুরুষ তুলিকে একবার দেখলে মুখ ফেরাতে পারে না। বার বার তাকায়। হা হয়ে তাকিয়ে থাকে। কেউ কেউ ভাবে, এতো সুন্দরী মেয়েটা সারাজীবন ধরেই যদি আমার চোখের সামনে থাকতো। তারপরও এই মেয়েকে নিয়ে বিপদে পড়তে হলো। সুন্দর সুন্দর সচ্ছল ঘর থেকে তুলির বিয়ের প্রস্তাব আসে। কিন্তু সঙ্গে একটা শর্ত থাকে জামাইকে কি দেবেন। যৌতুক হিসাবে যা চায়, তা তুলির বাবা মা'র তরফ থেকে সম্ভব হয় না। তুলিদের সাংসারিক অবস্থা খুব সচ্ছল নয়। তা বলে না খেয়ে থাকতে হয় না কখনও। জমি জিরাত যা আছে, তাতে যে ফসল পায় সারা বছর নিজেরা খেয়েও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। যা দিয়ে কাপড় চোপড়, ওষুধ পথ্যি, ডাক্তার কবিরাজ এবং ঈদ পরবের খয়-খরচায় শেষ হয়ে যায়। এই সংসারে নগদ টাকা পয়সা জমানো যায় না। কিন্তু যৌতুক ছাড়া কেউ বিয়েতে রাজীও হয় না। ছেলের চাইতে তার বাবা মায়ের লোভটাই বেশী থাকে। এসব হলো তুলির জীবনের অভিজ্ঞতা। সুন্দর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে পেলে অনেক যুবকই যৌতুকের কথা ভুলে যায়। কিন্তু তার বাবা মা আত্মীয় স্বজনরা ভোলে না।

ভালো ভালো কয়েকটা বিয়ের প্রস্তাব এই যৌতুকের কারণে নষ্ট হয়ে গেলে একদিন তুলিই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, সে আর বিয়ে করবে না এ জীবনে। তখন অনেক চেষ্টা করে এই প্রাইমারী স্কুলের চাকরিটা নেয়। মাস শেষে বেতনের টাকাটা জমা রাখে। এই টাকা জমানোর ইচ্ছেটা তুলির নয়। তুলির বাবাই বলেছে টাকাগুলো জমা রাখো ব্যাঙ্কে। আমরা কী চিরদিন বেঁচে থাকবো। এই পৃথিবীতে কোনো মেয়েই একা একা বাঁচতে পারে না। একদিন না একদিন বিয়ে তাকে করতেই হবে। টাকাগুলো জমা থাক। যৌতুক যখন এযুগের চাহিদা; বিয়ে করতে হলে তো সেই চাহিদাও পূরণ করতে হবে। মাঝে মাঝে তুলি ভাবে, এই সমাজের যুবকগুলো এরকম কেন? তাদের হৃদয় বলে কী কিছু নেই? বাবা মা অন্যায় কিছু বললেও তা শুনতে হবে। তারাইতো মিটিং মিছিলে শ্লোগান দেয়, নারী নির্যাতন বন্ধ করো। সেই তারাই আবার ব্যক্তি জীবনে এসে এতো লোভী হয়ে যায় কেন?

পুরুষদের প্রতি একটা ঘৃণা জন্মেছে তুলির মনে। সহজেই সে কোনো পুরুষকে বিশ্বাস করে না। যুবতীর মন তো সব সময় একটা স্বপ্নের পুরুষ খুঁজে বেড়ায়। নিরিবিলি নির্জনে তার একটু স্পর্শ চায়। এসব স্বপ্ন সাধের কথা মনে হলেই, মনটাকে তখন ছিঁড়ে খুড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে চায় তুলি। একা একাই মনের সঙ্গে লড়াই করে। তুলির সচেতন বোধের কাছে খেয়ালী মনটা তখন পরাজিত সৈনিকের মতো মাথা নীচু করে থাকে।

বাস্তবের কঠিন কঠোর জীবন আর দায়িত্বহীন রোমান্টিক যৌবন যখন মনে মনে যুদ্ধ করতে করতে তুলিকে স্তব্ধ করে ফেলেছে, ঠিক তখুনি মিতু আর ঋতু এসে খুশী মনে বিয়ের প্রস্তাব রাখলো তুলির বাবা মা'র কাছে। দেনা পাওনার কোনো হিসেব তারা করতে আসেনি। ওরা শুধু তুলির মতো মেয়েটাকে চায়। আর যৌতুক? এই প্রথাটাকেই তারা ঘৃণা করে। এই যৌতুকের প্রশ্নটা যেখানেই উঠবে, তারা সেই সীমানা থেকেই দূরে চলে যাবে। এই শিক্ষা দিয়েছে তাদের বড় ভাই। এই মুহূর্তে যার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে মিতু আর ঋতু।

আমাদের সমাজে কী এরকম পুরুষ এখনও আছে? প্রথম প্রথম সন্দেহ হয়েছিল তুলির। এ রকম কথা বিশ্বাসই করতে পারেনি। তারপর যেদিন মিতু আর ঋতু মাকে সঙ্গে নিয়ে এসে বিয়ের প্রস্তাবটা পাকাপাকি করে ফেললো; তখন থেকেই তুলি চারুকে না দেখেই মনে মনে ভালোবাসতে লাগলো। মিতু আর ঋতু চারুর একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি দিয়েছে তুলিকে। তুলি সেই ছবিটাকেই ভালোবেসে ফেলেছে। ছবিটা বালিশের নীচেই

রাখে। সময় সুযোগ পেলেই ছবিটা বালিশের নীচ থেকে বের করে। অবাক হয়ে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝেই স্টেশন মাস্টার বলে ছবিটার দিকে ভেংচি কাটে। আবার তা সযত্নে বুকে চেপে ধরে, চারুকে নিয়েই ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে। গভীর ঘুমের ভেতরেও চারু স্বপ্ন হয়ে আসে তুলির কাছে। তুলিকে আদর করে। জীবন দিয়ে ভালোবাসে। তুলির ডাগর ডাগর চোখ দুটিকে চুমো খায়। ঘন চুলের খোঁপায় ফুল গুঁজে দেয়। যখন তখন তুলিকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নয়। যেন চারু তার হৃদয়ের শব্দ শোনায়। চারুর হৃদয় জুড়ে শুধু তুলি তুলি শব্দের ধ্বনি। নদীর ঢেউয়ের মতো দিনরাত তোলপাড় করছে চারুর হৃদয়ে। এরকম স্বপ্নটা যখন ভেঙে যেতো রাতের নির্জনে একা একাই নীরবে কেঁদে ফেলতো তুলি। আর তখন শুধু একটা প্রশ্নই তুলির মনে ঝড়ো বাতাসের মতো ঘুরে ঘুরে বলতো, কবে? কবে তার সঙ্গে দেখা হবে।

বর্ষার এক তুমুল বৃষ্টির রাতে, তুলিকেই তুলির মন সান্ত্বনা দিয়ে বসলো, আশ্বিন মাসের আঠারো তারিখেই তার সঙ্গে দেখা হবে।

চারু তার স্বপ্নের পুরুষ। এখনো তাকে স্বপ্নের মতই লাগে। চারুর কথাবার্তা। চলাফেরা। বিদ্যাবুদ্ধি। ধৈর্য্য ক্ষমতা। আদর ভালোবাসা। এমন কি ওর চুপচাপ থাকাটাও সবার চেয়ে আলাদা মনে হয়। চারু সব সময়ই কথা বলে কম। যেন খুব সহজেই হৃদয়টাকে খরচ করতে চায় না। চারুকে দেখে দেখে যেন সব সময় মনে মনে ছবি আঁকে তুলি। এই ছবি ভালোবাসার ছবি। হৃদয়েই থাকবে। কোনোদিন কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। তুলির সব যন্ত্রণাই সহ্য করে চারু। রাগারাগি ঝগড়াঝাঁটির ভয়ে, কদিন যাবত কথা বলে খুব কম। অন্যায়তো তুলিই করেছে। হঠাৎ সে চারুকে না বলে গভীর রাতে চলে গেলো কেন? ফিরলো তো পাঁচদিন পর। একটা ঘরের নতুন বউ যদি পাঁচ দিন নিখোঁজ থাকে, পৃথিবীতে এমন কে আছে সেই বউকে আবার ঘরে তুলে নেবে? চারুর মতো স্বপ্নের পুরুষই পারে আবার তাকে কাছে টেনে নিতে।

সেই জন্যেই তো মনে মনে তুলি তার কাছে কৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধা ভালোবাসা সবই দ্বিগুণ হয়ে বুকভরা আদর সোহাগ নিয়ে তুলি দিনরাত সুখী রাখতে চাচ্ছে চারুকে। তাদের দু'জনার ভেতরে আর কোনো ভুল বোঝাবুঝি যাতে না হয় সেই কারণেই তো সব খুলে বলতে চাচ্ছে তুলি। কিন্তু যখুনি তুলি বলতে চায় সে সব কথা, সঙ্গে সঙ্গেই চারু তুলিকে থামিয়ে দেয়। কখনও রেগে যায়। আবার কখনও বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সে সব কথাগুলো শুনতেই চায় না। কেন? কেন এমন করছে চারু। শুনলেই তো বুঝতে পারবে তুলির কোনো দোষ নেই। খামোখা একটা ভুল চিন্তা বুকে রেখে সারাজীবন বসবাস করবে তুলিকে নিয়ে? তাতে কী সুখী হতে পারবে চারু? সেদিনের ঘটনাগুলো ঘটেছে ভীষণ অযাচিত ভাবেই। প্রচণ্ড হাসি খুশির মধ্যে হঠাৎ ভয়াবহ এক ঝড়ে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা ছিল। রাত অনেক। স্টেশন ফাঁকা। যাত্রীদের কোনো হৈচৈ ছিল না। আকাশ খুব পরিষ্কার। সে রাতে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটেছিলো আকাশ জুড়ে। এতো নক্ষত্র বছরে দু'চার বার দেখা যায়। বার বার মনে হচ্ছিলো এই সময়ে চারু পাশে থাকলে খুব মজা হতো। সারারাত আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

চারু গেছে ঢাকায়। অফিসের কাজে। ফিরতে দু'তিন দিন দেরী হতে পারে। চারদিক অন্ধকারে ঢাকা। আকাশে ঝিকমিক করে সব তারাগুলো জ্বলছে। ছোট ছোট ঠান্ডা হাওয়া আসছে মাঝে মাঝেই। সেই হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে শিউলী ফুলের গন্ধ। সেই রাতে ফুলও ফুটেছিল অসংখ্য, শিউলি গাছটা ঝুঁকে পড়েছিলো হাজার হাজার ফুলের ভারে। বাড়িতে কেউ নেই। কাজকর্ম শেষ করে মেন্দী মেয়েটাও চলে গেছে অনেক আগে।

শিউলি তলায় যেতে মানা করেছে চারু। ফুলের গন্ধে সাপ আসতে পারে। বাইরে এতো সুন্দর পৃথিবী রেখে ঘরের ভেতরেও যেতে ইচ্ছে করছে না। বার বার শুধু চারুর কথাই মনে পড়ছে। চারু পাশে থাকলে ওরা ফাঁকা স্টেশনে চলে যেত। ঘুরে বেড়াতো সারা রাত। ঘুম না আসলে ওরা প্রায় রাতেই ফাঁকা স্টেশনে যায়। ঘুরে বেড়ায়। সবচাইতে মজা হয় জোছনা রাতে। দূরে দূরে অনেক দূরের ঘুমন্ত গ্রামগুলো তখন ছবির মতো লাগে। তেপান্তরের মাঝখান দিয়ে ধূ ধূ একটা রেললাইন যেতে যেতে হঠাৎ একটু বাঁকা হয়ে হারিয়ে গেছে বহু দূরে রাতের বেলায় কোনো কোলাহল থাকে না। নিঝুম নিঝুম এই দৃশ্যগুলো তখন ভীষণ ভাবে অনুভব করা যায়।

প্রকৃতির সঙ্গে যেন মিশে গেছে। নিজের অস্তিত্বের কথাও ভুলে গেছে তুলি। ঠিক এমনি সময় এতো গভীর রাতে কে যেন বাড়ির গেটে ভীষণ চড়া গলায় কাকে যেন ডাকছে। তুলির মনে হলো, চারু এসেছে বোধহয়। সে এক দৌড়ে গেটের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

– কে?

ওপাশ থেকে উত্তর এল।

– আমি, আমি। আমি তুলি আপা। আমি নবীন। গেট খুলো তাড়াতাড়ি। গেট খুলেই খুব উৎকণ্ঠা নিয়ে তুলি বললো,

– নবীন তুই? এতো রাতে? বাড়ির কোনো দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছিস?

– না বাড়ির সবাই ভালো আছে!

– তাহলে?

– দুলাভাই কোথায়?

ওতো বাড়িতে নেই। ঢাকায় গেছে।

– তোকে একলা রেখে?

– না না, ফাটু বলে একটা ছেলে আছে। রাত অনেক তো? রাত তিনটেয় একটা মেল ট্রেন আসবে। ও বোধহয় স্টেশনে গেছে।

– চল্ ঘরে চল্।

– আহা কী হয়েছে বলবি তো

– এসব কথা ঘরের বাইরে বলা ঠিক না

– চল।

নবীনকে নিয়ে ঘরে গেলো তুলি।

বসতে না বসতেই নবীন বললো,

–আপা, শেলুর কথা তোর মনে আছে?

–শেলু? হ্যাঁ, মনে থাকবে না কেন? মনে আছে।

এই বলেই আপন মনে তুলি একটু মুচকি হাসলো। তারপর নবীনের দিকে তাকিয়ে বললো,

–এই শেলুই তো মাঝে মাঝে আমার কাছে প্রেমের চিঠি পাঠাতো। নবীন

–বল আপা।

–তোর খুব ক্ষুধা লেগেছে। আমি একটু রান্নাঘরে যাই। তোর খাবার ব্যবস্থা করি।

–আরে খাওয়া-দাওয়ার কথা বাদ দে। তুই তো বুঝতেই পারছিস না, আমি কেন এসেছি!

–কেন?

–তোর বিয়ে হয়ে গেছে বলে শেলু বিষ খেয়েছে।

–কি? কি বললি? শেলু বিষ খেয়েছে?

–হ্যাঁ, তোর জন্যে বিষ খেয়েছে।

–আমার জন্যে বিষ খাবে কেন? আমার সঙ্গে তো ওর কোনো সম্পর্ক ছিলো না।

–আমি তো সবই জানি। আমাকে বলে লাভ কী? শোন আপা, ও বিষ খাওয়ার আগে, তোর নামে একটা চিঠি লিখেই বিষ খেয়েছে। চিঠিতে লিখেছে কি জানিস? তুলি, তোমার কাছে আমি অনেক চিঠি লিখেছি। আজ পর্যন্ত একটা চিঠিরও উত্তর দাওনি। আমি কি এতোই খারাপ? তুমি আমাকে এতো ঘৃণা করো? এ জীবন রেখে লাভ কী? তোমার নামেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলাম। চলে গেলাম তোমাদের সুন্দর পৃথিবী থেকে।

নবীনের কথা শোনে পাথর হয়ে গেলো তুলি। শরীরের রক্ত চলাচল যেন বন্ধ হয়ে গেছে। এইমাত্র মাথাটা ধু ধু শূন্যের মতো হয়ে গেলো। তুলির কোনো ভাষা নেই এখন। তুলির হাত-পা-চোখ সব অনড় হয়ে আছে।

তুলির এই অবস্থা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো নবীন। খুব জোরে জোরে ডাকতে লাগলো তুলিকে,

–আপা, আপা, এই তুলি আপা। কথা বলছিস না কেন? আপা, আপা, এই তুলি আপা।

এই বলেই নবীন খুব জোরে একটা ঝাঁকুনি দিলো তুলিকে।

তুলি যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, এইমাত্র ফিরে এলো নবীনের ঝাঁকুনি খেয়ে এবং খুব অসহায়ের মতো বললো,

–এখন কি হবে?

নবীন এ কথার উত্তর না দিয়ে অন্য প্রশ্ন করলো,

–আপা শেলুর চিঠিগুলো কী তোর কাছে আছে?

–হ্যাঁ।

–কোথায় রেখেছিস?

–বাড়িতে।

–বাড়ির কোন জায়গায় রেখেছিস?

–তুই খুঁজে পাবি না। আমাকে যেতে হবে।

–তাহলে চল। রাত তিনটেয় একটা ট্রেন আছে। চিঠিগুলো পুড়ে ফেলতে হবে। শেলুর কোনো চিহ্ন রাখা যাবে না। দুলাভাই যদি এসব কথা জানে, সর্বনাশ হয়ে যাবে। তোর ওই সাজানো সংসার ছিন্নভিন্ন হয়ে ছিটকে পড়বে। দাঁড়িয়ে আছিস কেন, চল।

পাথরের মতো স্তব্ধই ছিল তুলি। নবীনই টেনে-টুনে ঘর থেকে বের করলো তুলিকে। নবীন খুব সতর্ক ছেলে। চাবি নিয়ে দরজায় তালা দিলো। এমনভাবে তুলিকে স্টেশনে নিয়ে গেলো, এখানকার কেউ যেন তুলিকে দেখতে না পায়। চারু, চারুর সংসার। এসব আর কিছুই যেন মনে নেই তুলির। সে শুধু ভাবছে শেলুর কথা। তাদের গ্রামেরই ছেলে শেলু। দুই পুরুষ আগে থেকেই ওদের অবস্থা খুব সচ্ছল। ওর দাদা, কোনো এক ইংরেজ সাহেবকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল বলে প্রায় এক হাজার বিঘা ধানী জমি পেয়েছিল সেই আমলের ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে। তখন থেকেই ওরা বড়লোক। সম্পত্তি আরও বাড়িয়েছে ওর বাপ-দাদা। দুটো বড় বড় পুকুরসহ বাড়ি। দু'তলা টিনের ঘর। বাড়ি বোঝাই কাজের লোক। কিন্তু শেলু হয়েছে

হাবা-গোবা ধরনের ছেলে। ম্যাট্রিক ফেল করেছে কয়েকবার। মাথায় কিছু নেই। হাতের লেখাও ভালো না। অনেক আগেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। ওকে দিয়ে কোনো কাজই হয় না। ক্ষেত-খামারের কাজও জানে না। শুধু খায়, ঘুমায় আর সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। গ্রাম তো, পয়সা খরচ করতে পারে বলে, দু'চারজন চামচা গোছের বন্ধু, সব সময় শেলুর সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। শেলু ডাব খাইতে চাইলে ডাব এনে দেয়। চা খাইতে চাইলে চায়ের বন্দোবস্ত করে। নিজের মুখের সিগারেটটাও ধরিয়ে দেয় অন্যজন।

একদিন স্কুলে যাবার সময় তুলি দেখলো, রাস্তার পাশেই শেলু দাঁড়িয়ে আছে তুলির দিকে তাকিয়ে। পলক পড়ছে না। তুলিকে দেখে যেন হা হয়ে আছে। লজ্জায় তুলি খুব দ্রুত হেঁটে স্কুলে চলে গেলো। স্কুলের মাঠ থেকে আরেকবার দেখার চেষ্টা করেছিল শেলুকে। তুলি যা ভাবছিল ঠিক তাই। শেলু এখনও অইখানেই হা করে দাঁড়িয়ে আছে তুলির দিকে তাকিয়ে।

তারপর থেকেই স্কুলে যাওয়ার পথে সকাল-বিকেল দাঁড়িয়ে থাকে শেলু। একবার স্কুলে যাওয়ার সময় হা হয়ে তাকিয়ে থাকে। আরেকবার স্কুল থেকে ফেরার সময় দেখা হয় শেলুর সঙ্গে। আর বন্ধের দিন, তুলিদের বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতো একা একাই। প্রচণ্ড রোদ মাথায় নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতো।

একদিন স্কুলে যাচ্ছে তুলি। হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়ালো শেলু। খুব বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেলো তুলি। মনে হলো তখখুনি কী যে কী বলবে শেলু। কিন্তু না, কোনো কথাই বললো না। শুধু একটা চিঠি তুলিকে দিয়ে খুব দ্রুত সেখান থেকে চলে গেলো শেলু।

চিঠিটা না পড়েই লুকিয়ে রাখলো তুলি। বাড়ির সবাই যখন গভীর রাতের ঘুমে, তখন শেলুর চিঠি খুলে পড়তে লাগলো তুলি। এমা, হাতের লেখা কি বিচ্ছিরি! প্রতিটা শব্দের বানান ভুল। ভালোবাসি শব্দটাকে লিখেছে এইভাবে, 'বালবাসী'। চিঠিটা সম্পূর্ণ পড়তে পারেনি, তার আগেই খিলখিল করে হেসে উঠেছে তুলি। একা একাই হাসতে হাসতে বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছিলো। হঠাৎ মনে হলো রাত অনেক। এতো রাতে, এতো জোরে জোরে হাসা তার উচিত হয়নি। প্রাইমারী স্কুলের টিচার তো। বানান ভুলের প্রমাণ হিসাবে চিঠিটা ছিড়ে ফেললো না। সযত্নে লুকিয়ে রাখলো। আরও একটা মজার ব্যাপার, চিঠি লেখার শেষে নিজের নাম লিখেনি শেলু। লিখেছে, তোমারই পাগলা বাউল।

এরপর প্রতিদিন একটা করে চিঠি দেয় শেলু। কখনো নিজের হাতে। কখনো অন্যকে দিয়ে পাঠায়। মাঝে মাঝে সাত আট বছরের একটা বাচ্চাও চিঠি নিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত ধরলো নবীনকে। নবীন যেদিন চিঠি নিয়ে এলো, সেদিন খুব রেগেছিল তুলি।

–তুইও কী শেলুর চামচা!

নবীন বলেছিলো, ওতো একটা হাবা-গোবা। প্রায় উন্মাদের মতো। ওর সঙ্গে আমরাও যদি পাগলামী করি, দুর্নাম হবে আমাদের। ওকে কেউ কিছু বলবে না। তবে সাবধান তুলি আপা, তোকে তো আমি চিনি। হঠাৎ রাগটাগ করে ওর কোনো চিঠির উত্তর দিস না। তাহলে অই চিঠি নিয়ে সারা গ্রাম দৌড়াদৌড়ি করে সবাইকে দেখাবে। তুই লজ্জায় পড়ে যাবি। অজপাড়াগাঁ তো, কিছু না জেনেই মানুষ তোর কলঙ্ক রটাতে পারে। তুলি ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশ্ন করে,

–নিজেকে তুই কি মনে করিস, আমার চাইতে তোর বুদ্ধি বেশী?

–না না, তা মনে করবো কেন?

–তোর এতো আদেশ উপদেশ শুনে তো তাই মনে হলো।

–না তুলি আপা, সে অর্থে আমি তোকে কিছু বলিনি। তোর রেগে যাওয়ার চেহারাতো আমরা দেখেছি। তুই যখন রেগে যাস, ভূত-ভবিষ্যৎ কিচ্ছু তোর মনে থাকে না।

–নবীন, তুই আমাকে নিয়ে এমন কথা ভাবলি কী করে? রেগে গেলেও এরকম একটা মূর্খ, হাবা-গোবার বানান

ভুল চিঠির উত্তর দেবো আমি?

রাগে থরথর করে কাঁপতে থাকে তুলি। নবীন আর কথা বাড়ায় না। মাথা নীচু করে চলে যায় ওখান থেকে।

আরও কয়েকটা চিঠি দিয়েছে শেলু। তুলি কখনও চিঠি ফেরত দেয়নি। ও একটা পাগল। ফেরত দেয়া চিঠি নিয়েও গণ্ডগোল বাধাতে পারে। যখনি চিঠি দেয়, না পড়েই সব চিঠি এক সঙ্গে বেঁধে লুকিয়ে রাখে। মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে, শেলুর সব চিঠিগুলো পুড়ে ফেলি। আবার ভেবেছে, থাক না, ওর হাতের লেখার যা ছিরি, অই চিঠি কেউ সহজে পড়তেও পারবে না। হাবা-গোবা যা-ই হোক, অই চিঠিগুলোর মধ্যে একজন মানুষের কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে। সেগুলো আগুনে পুড়ে ফেলার সময় খুব খারাপ লাগবে।

রাতের ট্রেন। হু হু করে ছুটে যাচ্ছে। জানালার বাইরে ঘন-ঘোর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। তুলির চোখে-মুখে বিষণ্ণতার ছাপ পড়েছে। কী হবে না হবে, এই দুশ্চিন্তায় ক্রমাগত ভেতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে। তুলিই নবীনকে জিজ্ঞাসা করলো ফিস্‌ফিস্‌ করে,

–শেলুর অবস্থা কী রকম দেখে এসেছিস, বাঁচবে না।

–আমি তো যাইনি শেলুর কাছে। ঘটনা শুনেই ট্রেন ধরে সোজা তোর কাছে চলে এলাম।

–কার কাছে শুনেছিস?

–আমার এক বন্ধু আছে। হিন্দু। হৃদয় নাথ। বলরামপুর হাসপাতালের ডাক্তার। ওর কাছেই খবরটা পেলাম। লোক মারফত ও আমাকে ডেকেছিলো। আমি খুব তাড়াহুড়ো করে তার কাছে গিয়েই সব শুনলাম। হৃদয় নাথই বললো, শেলুর অবস্থা খুব খারাপ। ও নাকি বিষ খেয়েছে।

–চিঠিটা কী হৃদয় নাথ পড়েছে?

–তাতো জিজ্ঞাসা করিনি।

ট্রেন বোধহয় চলে এসেছে। সামনেই তাদের স্টেশন। স্টেশনের নাম বয়ড়া। এখানেই ওরা নামবে। তারপর কিছু হাঁটা পথ আছে। ট্রেনের গতি কমে আসছে। ট্রেন চলার শব্দটাও এখন অন্যরকম। ট্রেন থামার আগেই তুলি বললো,

–নবীন

–কিছু বলবি?

–প্রথমেই কিন্তু বাড়ি যাবো না।

–তাহলে? কোথায় যাবি?

–হৃদয় নাথের বাড়ি যাবো আগে।

–এতো রাতে কী–

–রাত তো প্রায় শেষ। আমরা যেতে যেতেই ভোর হয়ে যাবে।

–ঠিক আছে। হৃদয় নাথের সঙ্গে আগে দেখা করবো।

বেশী ডাকাডাকি করতে হলো না। বাড়ির দরোজায় কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এলো হৃদয় নাথ। খুব অল্প বয়সের ডাক্তার। নবীনের বন্ধু যখন, এ রকম বয়সইতো হবে।

নবীন প্রথমেই বললো,

–আপাকে নিয়ে এসেছি।

–বলিস কি, আপা ভেতরে আসেন।

তখনও রাত শেষ হয়নি। চারদিকেই অন্ধকার ভারি হয়ে আছে। পাড়াপড়শী এখনও ঘুমে অচেতন। কোনো রকম সাড়া-শব্দ নেই কোথাও। শোবার ঘরেই যেতে হলো সবাইকে। ঘুম-ঘুম চোখে দাঁড়িয়ে আছে হৃদয় নাথের বউ। হাতে শাখা। সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ। অল্পদিন হলো বিয়ে করেছে। বউটির বয়স উনিশ/বিশ। তুলির চাইতে বয়সে অনেক ছোট। টুকটুকে ফর্সা মেয়ে। লণ্ঠনের আলোতেও শরীরের রঙ জোছনার মতো লাগছে। নবীন বললো,

–শেলুর অবস্থা এখন কী রকম?

ডাক্তার অপরাধীর মতো বললো,

–আমি তো তোকে ভুল খবর দিয়েছি নবীন।

–ভুল খবর?

–হ্যা। শেলু বিষ খায়নি। অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলো!

–তাই

–হ্যা, আমি তো কিছুক্ষণ আগেই হাসপাতাল থেকে আসলাম। আমি যখন তোকে খবরটা দিয়েছি, তখনও শেলুকে দেখিনি। লোক বলেছে বিষ খেয়েছে। আমিও তাই তোকে বলেছি।

–আর অই চিঠিটা?

–ওটা আমার কাছেই আছে। যারা আমাকে ডাকতে এসেছিলো, তারাই আমার হাতে চিঠিটা দিয়েছে।

–শেলু এখন কেমন আছে?

–স্টমাক ওয়াশ করে দিয়েছি, বেঁচে যাবে এ যাত্রায়।

–হৃয়দ, আমরা তাহলে চলি এখন।

–আরে আপাকে নিয়ে এসেছিস, আপা কী আমার বাড়ি থেকে খালি মুখে যাবে? ডাক্তারের বউ বললো,

–মুখে কিছু না দিয়ে আপা যেতে পারবে না।

বউটা খুব মিষ্টি। ওর নামটাও সেই রকম। দীপালি। শেষ পর্যন্ত শেষ রাতে সন্দেশ খেতে হলো। চা বানাতে চেয়েছিলো দীপালি। তুলিই ওকে মানা করলো। আসার সময় হৃদয় নাথ বললো,

–আপা, এই চিঠিটা অনেক ঝামেলা বাধাতে পারে। যারা নিয়ে এসেছিলো, তারা কেউ পড়তে পারে না। যা জানার আমি জেনেছি। চিঠিটা আপনাকেই দিচ্ছি। আপনি পুড়ে ফেলবেন। এই নিন।

চিঠি নিয়ে সোজা বাড়িতে চলে এসেছে তুলি। সঙ্গে নবীন। এতো ভোর বেলায় তুলিকে দেখেতো মা অবাক। হাতে কোনো সুটকেস নেই। এক কাপড়ে চলে এসেছে। বাবা বললো মায়ের কানে কানে,

–নিশ্চই ঝগড়া করে এসেছে তোমার মেয়ে।

মা খুব আস্তে করে বললো,

–পরে– পরে। এখন এসব বলার দরকার নেই। তুমি চুপচাপ থাকো। তুলিই আমাকে সব বলবে।

মাকে সব খুলেই বললো তুলি। মা শুনে তো হতবাক। জানাজানি হয়ে গেলে তো আমার মেয়ের সংসারটাই ভেঙ্গে যেতো। মেয়ে তার বিরাট বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে বলে আল্লাহতায়ালাকে ডাকলো। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী না থাকলে এরকমভাবে বিপদ মুক্ত হয় না। নবীনকেও আশীর্বাদ করলো মা। নবীনের মাথায় হাত বুলিয়ে দীর্ঘ আয়ুর জন্য আল্লাহতায়ালার কাছে প্রার্থনা করলো।

সেদিন ভোর বেলাতেই তুলি শেলুর সমস্ত চিঠি পুড়ে ফেললো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠা আগুনে সব ছাই হয়ে গেলো কয়েক মুহূর্তেই।

তুলির মনটা সব সময় একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। সব চিঠিগুলো পুড়ে ফেলার পর তার মনে হলো, দুই একটা চিঠি রেখে দিলেই পারতাম। এই ঘটনা যখন চারুকে বলবে, তখন নমুনা হিসেবে দু'একটা চিঠি চারু নিজের চোখে দেখলে বুঝতে পারতো, সত্যি সত্যিই কী মহা ঝামেলায় পড়েছিলো তুলি।

সেই দিনই চলে আসার কথা কিন্তু বাপ-মা কী আসতে দেয় এভাবে। বাবা বলেছিলো, আমি নিজেই চলে যাই। জামাই বাবাজীকে নিয়ে আসি। তুলি বাধা দিয়েছে,

–ও আসতে পারবে না। ও এখন ঢাকায় আছে অফিসের কাজে।

এই কথা বলেও আবার বিপদে পড়ে গেলো তুলি। বাবা তখন জোর গলায় বললো,

–তাহলে তুইও দু'তিন দিন এখানে থেকে যা। খালি বাড়িতে গিয়ে কী করবি? একা একা আরও খারাপ লাগবে।

তুলি খুব অসহ্য হয়ে বললো,

–ওকে বলে আসিনি তো। ও খুব রেগে যাবে!

–আমাদের জামাই খুব ঠান্ডা মেজাজের মানুষ। বাবা-মা'র কথা শুনলে রাগবে কেন?

বাবা-মাকে খুশী রাখতে গিয়ে চারদিন দেরি হয়ে গেলো। তুলি আসলো পাঁচ দিনের মাথায়। ট্রেনে উঠিয়ে দেয়ার সময় নবীন বলেছিল,

–আপা, এখনও ভেবে দ্যাখ, আমি তোর সঙ্গে যাবো কিনা।

–না না, যেতে হবে না। তোর দুলাভাই মাটির মানুষ। কোনো ঝামেলা হবে না।

ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো ঝড়বৃষ্টি। জানালাগুলো সব বন্ধ করে দিতে হলো। তারপরও চুইয়ে চুইয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টির পানি ঢুকলো ট্রেনের কামরায়।

সাত

চারু খুব নির্জনতা ভালোবাসে। চাকরির সময়টাতে ভীষণ হৈ চৈ থাকে। স্টেশনে কতো রকমের যাত্রী। তাদের কতো বিভিন্ন সমস্যা। এইসব জংশন স্টেশনে, কারো কোন সমস্যা হলেই ছুটে আসে স্টেশন মাস্টারের কাছে। আরও কতো কর্মচারী আছে কিন্তু তাদের কাছে কেউ যায় না। লোকজনের ধারণা, স্টেশন মাস্টার ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। এমনকি ন'টার ট্রেন ক'টায় ছাড়বে, তার উত্তরও স্টেশন মাস্টারকেই দিতে হয়। এইসব ঝামেলা সেরে যখন সে বাড়ি ফেরে, তখন সব দিক থেকেই নীরবতা চায়। নিজেও কথা খুব কম বলে। নির্জনতা পেলে মেজাজটা শান্ত থাকে। বিশ্রাম নিতে পারে কিছুক্ষণ।

এসবের কিছুই জানতো না তুলি। জানবে কী করে, ওদের বিয়ের এখনও কী একমাস পার হয়েছে? এতো স্বল্প সময়ের মধ্যে একজন মানুষের সব কিছুই কী জানা যায়? সময় লাগে। একটি করে দিন যায় আর তার অভিজ্ঞতা বাড়ে। একটু একটু করে সব বুঝতে পারছে তুলি। মানুষটার জ্ঞান-বুদ্ধি খুব প্রখর। জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও বেশী। অনেক মানুষের শুধু মুখ দেখলেই বলে দিতে পারে, তার ভেতরের অবস্থা কী রকম।

অনেকের আচার-ব্যবহার দেখেই বুঝতে পারে লোকটা কি ধরনের। ফাটুর ভাষায় ফাটু বলে,

–আমগো সায়েব অইলো জ্যোতিষ্টি, হাত দেখে না, মুখ দেইখ্যাই ভিতরের সব খবর কইতে পারে।

আর মেন্দী মেয়েটা বলে,

–আমগো সায়েবরে ফাঁকি দেওয়া মুস্কিল। মাইনষের চোখ দেখলেই বুইঝ্যা ফ্যালায় সব।

এরা দু'জন অনেক দিন যাবত এই কোয়ার্টারে আছে। তুলির চাইতে সাহেব সম্পর্কে এদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। ইদানীং তুলি অবসর পেলেই ওদের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটায়। সাহেবের প্রিয় অপ্রিয় জিনিসের কথা জিজ্ঞেস করে। কী তার পছন্দ, কী তার অপছন্দ। কোন জিনিসটা পেলে খুব খুশী হয়। কোন জিনিস ঘৃণা করে। তুলি যে বিশদভাবে স্বামীর সব কিছুই জানতে চাচ্ছে, এই ব্যাপারটা আবার তাদেরকে বুঝতে দেয় না। গল্প করার ফাঁকে ফাঁকে, হঠাৎ করেই জানতে চায় তুলি। ওরাও, গল্প-গুজবে মজে গিয়ে সহজভাবেই সব বলে দেয়। হাসাহাসিও করে। পরনিন্দা পরচর্চাও হয়। এইভাবেই আস্তে আস্তে চারুকে জানার চেষ্টা করছে তুলি।

আকাশ মেঘলা। যে কোন সময় ভারি বর্ষণ হতে পারে। বিসর্জনের পর এরকম হয়। একটানা বৃষ্টি হয় কয়েকদিন। তারপরে যে রোদ উঠে, অই রোদেই আস্তে আস্তে শীত নামে। প্রথম প্রথম কুয়াশা দেখা যায় সন্ধ্যার আগে আগে। হালকা কুয়াশা। সকাল বেলায় টের পাওয়া যায়, রাতে বোধ হয় শিশির পড়েছে, মাঠের সবুজ ঘাসগুলো ভেজা ভেজা লাগে। তারও অনেক পরে শীত নামে। হাড় কাঁপানো শীত।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে, হাতমুখ ধুয়ে নাশতা করে শুয়ে পড়েছিলো চারু। হঠাৎ করেই কখন যে ঘুমিয়ে গেছে, এখন তা বলতে পারছে না চারু। ঘুম থেকে উঠেই দেখছে ঘর অন্ধকার। সে যখন ঘুমিয়ে ছিলো, তখন তো আলো ছিল। একটু বিস্ময় নিয়েই ডাকলো তুলিকে। সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এসে তুলি লাইট অন্ করে দিলো।

মুহূর্তেই আলোকিত হয়ে গেলো রুমটা। চারুর প্রশ্ন,

–অন্ধকার ছিল কেন?

খুব ছোট্ট করে উত্তর দেয় তুলি,

–বাতি নিভিয়ে দিয়েছিলাম।

–কেন?

–দেখলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো। আলো থাকলে ঘুমটা ভেঙে যেতে পারে।

–কতোক্ষণ ঘুমিয়েছি?

–প্রায় আধ ঘন্টা।

–সেই জন্যেই খুব ফ্রেশ লাগছে। একটু চা খাওয়াবে?

–কিছু না বলেই খুব দ্রুত রান্নাঘরের দিকে গেলো তুলি।

এক সঙ্গে দু'জনেই চা খাচ্ছে। চা খেতে খেতেই তুলি বললো,

–এখানকার দুর্গাপূজায় নাকি খুব হৈ চৈ আনন্দ হয়। বিভিন্ন পাড়ায় পূজামন্ডপ থাকে?

–হ্যা, আমি তো শুনেছি, দেশ বিভাগের আগে দুর্গাপূজায় সব সময় খুব জমজমাট থাকতো এই শহরটা। আস্তে আস্তে এদেশ থেকে হিন্দুরা সব চলে গেছে। তারপরও, এখানে অনেক দুর্গাপূজার প্যান্ডেল হয়। বিসর্জনের দিনে তো তখন রাস্তা-ঘাটে মানুষের ভিড়ে হাঁটা যায় না।

–ইস, আমার খুব শখ ছিলো এই দুর্গাপূজা দেখার।

স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলে ফেললো চারু,

–দেখবে কি করে, তুমিতো তখন নিখোঁজ!

বলার পর পরই নিজের ভুল বুঝতে পারলো চারু। কথাটা এভাবে বলা ঠিক হয়নি। আরও অনেকভাবে কিংবা খুব আদর করেই বলা যেতো। এতো নিষ্ঠুরভাবে না বললেই হতো।

আকাশে ভারি মেঘ। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘরের ভেতর তুলি আর চারু চুপচাপ বসে আছে। অনেকক্ষণ যাবত কেউ কোনো কথা বলছে না। শেষ পর্যন্ত তুলিই আবার শুরু করলো,

–একটা কথা বলবো, রাগ করবে না তো?

আগের দোষটুকু ঢাকার জন্যে খোলা হৃদয়ে কথা বলতে লাগলো চারু।

–তুলি, আমি তোমার স্বামী। সারাজীবন আমরা এক সঙ্গে থাকবো। এখনও যদি কথায় কথায় পারমিশন চাও। অনুরোধ করো। যদি রেগে যাই, সেই ভয়ে কথাই বলতে চাও না। যদি দুঃখ পাই সে জন্যে চুপ থাকো। এ সবের কোনো মানে হয় তুলি। এতো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ভয় থাকলে তো তুমি আমাকে কোনোদিনই ভালোবাসতে পারবে না।

কথাগুলো শুনে তুলি খুব খুশী হলো। মনে হলো, এই কথাগুলো আরও আগেই বলা উচিত ছিল চারুর। মুহূর্তেই মনটা বেশ হালকা হয়ে গেলো। যখন তখন কথা বলার সাহস পেলো তুলি। তুলি বললো,

–না না, আমি যে কথাগুলো বলতে চাই তুমি তো শুনতেই চাও না। আমি যে কী বিপদে পড়ে সেদিন গভীর রাতে চলে গিয়েছিলাম।

–আবার, আবার সে-সব কথা বলতে শুরু করেছো?

–কেন? কেন সে-সব শুনতে চাও না তুমি? আমি দিনরাত অসহ্য এক যন্ত্রণায় ভুগছি। একটা ভুল যদি করেই থাকি, সেই ভুলের কথা তুমি শুনবে না? আমাকে সংশোধন করে দেবে না? আমি তোমার স্ত্রী। তোমাকে না বলে পাঁচ দিন বাইরে ছিলাম, কেন? কেন ছিলাম। এই কথাগুলো তোমাকে না জানালে, আমি জীবনেও সুখ পাবো না। আমার মনের ভেতরে সারাজীবন একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকেই যাবে। আমি সুখী হবো কী করে?

হু হু করে কেঁদে উঠলো তুলি। চারু ওর চোখের জল মুছে দিতে গেলো, তুলি আরও জোরে কেঁদে উঠলো। চারুর বুকে পড়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলো। চারু আর কোনো কথা বললো না। চারুর মনে হলো, ও এখন যতো বেশী কাঁদবে, ওর মনের যন্ত্রণা ততো কমবে। কাঁদুক। যতোক্ষণ ইচ্ছে ও কেঁদে কেঁদে মনটাকে হাল্কা করুক।

কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে গেলো তুলি। থেমে গেলো তার কান্না। কিন্তু মুখ সরালো না চারুর বুক থেকে। এক সময় তুলির কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো,

–আমরা এখনও খাইনি বলে মেন্দী মেয়েটা যেতে পারছে না। মুখটা ধুয়ে রান্নাঘরে যাও।

মেয়েটাকে বিদায় করো। এই নিয়ে আমরা রাতে কথা বলবো, যাও।

নীরবেই উঠে দাঁড়ালো তুলি। আঁচল দিয়ে দু'চোখ মুছতে লাগলো। আবার চারু বললো,

–না না। এভাবে যেও না। মুখটা ধুয়ে যাও।

চারুর কথা যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো তুলি।

বাইরে তুমুল বৃষ্টি। একটানা ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ। বৃষ্টি নেমেছে। খাওয়া-দাওয়ার পর যখন লাইট অফ্ করে ওরা শুয়ে পড়েছে, ঠিক তখনি, ঝম্‌ঝম্‌ করে যেন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো। বৃষ্টির শব্দে কেউ কারোর কথা শুনতে

পাচ্ছিল না। বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি। বাতাস নেই। শুধু বৃষ্টিই যেন গাছপালা, বাড়ি-ঘর ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে আজ। আষাঢ় শ্রাবণেও মনে হয় এতো শব্দ করে বৃষ্টি হয়নি কখনও। হয়তো হয়েছে, এরা দু'জন সেইভাবে অনুভব করতে পারেনি।

এই সময়ের বৃষ্টি তো, যতো জোরেই নামুক, বেশীক্ষণ থাকে না। আস্তে আস্তে কমে যায়। বৃষ্টি তখনও থামেনি। পড়ছেই। তবে আগের মতো নয়। ঝম্‌ঝম্‌ শব্দটা এখন ঝিরঝিরে হয়ে গেছে।

এতোক্ষণ চারুই তুলির বুকে মাথা রেখে শুয়েছিলো। তুলির এলোমেলো খোলা চুলগুলো বারবার চারুর মুখ থেকে সরিয়ে দিতে হয়েছে। এইবার তুলিই বললো,

–বলো কী বলতে চাও!

–তুমি কি বুঝবে আমার কথা?

–আমি প্রাইমারী স্কুলের টিচার ছিলাম, এ কথা কী ভুলে গেছো?

–তুমি তো বাংলা পড়াতে?

–হ্যাঁ!

–বাংলা ভাষার গভীরতা অনেক। আমি যা বলি, তা মনে-প্রাণে বোঝার চেষ্টা করো। শোনো, চারুর কথাগুলো এই রকম। তুলি, নদীতে অনেক ঢেউ। দু'চার পাঁচটা ঢেউ যদি হারিয়ে যায়, বর্ষার নদী কি তা টের পাবে? মনে করো, বিরাট ঝড়ে বটগাছের অনেক পাতা ঝরে যায়। বটগাছ কী তা টের পায়? মনে রাখে? এই যে আমাদের বাগানের শিউলি গাছটায় প্রতি রাতে হাজার হাজার ফুল ফুটে। ভোর বেলায় সব ফুল ঝরেও যায়। আবার সন্ধ্যা রাতে অসংখ্য ফুল ফোটে। গত সন্ধ্যার ঝরা ফুলগুলোর কথা কি মনে রাখে? মনে রাখে না। শোনো তুলি, জীবনটা অনেক বড়। এই জীবনের কাছে চার-পাঁচটা দিন খুবই সামান্য। মানুষ কতো হাজার হাজার দিনের কথা ভুলে যায়। স্মৃতি যা থাকে, জীবনের তুলনায় তাও খুব কম। তুমি এই চার পাঁচটা দিন-রাত নিয়ে এতো ভাবছো কেন বলোতো? মনো করো তোমার আমার এই দীর্ঘ জীবন থেকে চার পাঁচটা দিন হারিয়ে গেছে, ব্যাস, এইটুকু মনে রাখলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তুমি তোমার পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সে আমার ঘরে এসেছো। বিগত পঁচিশ বছরের তোমার প্রতিটি মুহূর্তের কথা কী বলতে পারবে আমাকে। পৃথিবীর কেউ পারে না। তুমিও পারবে না। সামান্য ক'টা দিনের কথা ভুলে যাও।

তারপরও তুলি বললো,

–তুমি তাহলে অই ক'টা দিনের কথা শুনবে না?

–ইচ্ছা নেই। আমাদের ভবিষ্যৎ কতো সুন্দর হবে, সেই কথা ভাবো। অই সামান্য ক'টা দিনের যন্ত্রণা নিয়ে, আগামী দিনগুলোর সুখ-শান্তি নষ্ট করো না।

এই রাতে আর কোনো কথা হয়নি দু'জনার। রাত তিনটের সময় ঝিরঝিরে প্যানপ্যানানি বৃষ্টির ভেতরে স্টেশনে গেছে চারু। আবার ফিরে এসে ডাকেনি তুলিকে। বৃষ্টির ঠান্ডা পেয়ে তুলি তখন গভীর ঘুমে। হাত-মুখ ধুয়ে মুছে শুয়ে পড়েছে চারু। ঘুম থেকে তুলি উঠেছে খুব ভোরে। বৃষ্টি আর থামেনি। অবিরাম ঝিরঝির করে ঝরছে। ফাটু আর মেন্দীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সকালের নাশতা তৈরী করেছে। ফাটুকে পাঠিয়েছে বাজারে। এখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে চারু। তুলি ভাবছে, আরও কিছুক্ষণ ঘুমাক। সকাল ঠিক ন'টায় চারুকে ডাকবে। এর আগে স্টেশনে কোনো ট্রেন নেই।

এমন বৃষ্টির নির্জনে তুলি ভাবছে, চারুর কথাই ঠিক। ও যখন শুনতে চাচ্ছে না, জোর করে বলতে চাইলে অশান্তিই হবে। এমনকি দু'জনার সম্পর্কে ফাটলও ধরতে পারে! তুলির হঠাৎ মনে হলো, বিয়ের আগের সমস্ত ঘটনাই তো মেয়েরা স্বামীর কাছে গোপন রাখে। কেউ কখনও মৃত্যুর আগেও স্বামীকে তা বলে না। এর পেছনে

যথেষ্ট কারণও আছে। এক পুরুষ আরেক পুরুষের কথা শুনলে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়। স্ত্রীকে অসতী মনে করে। শেলুর সঙ্গে তো তুলির কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এতোসব চিঠি, শেলুর বিষ খাওয়া, এসব শুনে যদি চারু মনে করে, অবশ্যই গভীর ভালোবাসা ছিল, তা না হলে শিলু বিষ খাবে কেন? ঘটনা যদি এইভাবে ধরে নেয় চারু। তাহলেতো সারাজীবনেও তুলি সুখী হতে পারবে না। তুলির প্রতি কোনো বিশ্বাস থাকবে না চারুর। আর এই বিশ্বাসটাই হলো স্বামী-স্ত্রীর সংসার। এই বিশ্বাসেই সংসার সুখের হয়। যে স্বামী স্ত্রীকে বিশ্বাস করে না। কোনোদিনই সেই সংসার সুখের হয় না।

সংসার করতে গেলে বোধ হয় সব সময় সত্যি কথা বলা যায় না। শুধু এটুকু সুখের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অনেক সত্যি কথা গোপন করে রাখে। প্রথম ভালোবাসার টানে, আবেগ উচ্ছ্বাস ভরা হৃদয় নিয়ে, সব সত্যি কথাই বলতে চেয়েছিল তুলি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, বিয়ের পরে যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসার ভেতরে অনেক বাঁধন আছে। ইচ্ছা থাকলেই সব বলা যায় না। এই ভালোবাসা হলো অঙ্কের মতো। যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ দেখে দেখে সংসার করতে হবে। অঙ্ক একটা ভুলে গেলেই ভালোবাসার দুর্নাম হবে। সংসারও ভেঙে যেতে পারে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো তুলি। আর কখনই সে-সব কথা বলবে না চারুকে। চারু যা বলেছে, সে কথাগুলোই ঠিক। জীবন অনেক বড়, তা থেকে কয়েকটা দিনের কথা ভুলে গেলে, জীবনের কিচ্ছু হবে না। জীবন জীবনের মতোই থাকবে।

–কি ভাবছো?

চমকে উঠলো তুলি। চারু যে কখন ঘুম থেকে উঠেছে, একটুও টের পায়নি।

ন'টা বেজে গেছে, তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমি নাশতা নিয়ে আসছি।

এই বলেই দ্রুত রান্নাঘরের দিকে ছুটলো তুলি।

আর কোনো রাগারাগি নেই। মান অভিমানও কেউ করে না। দিনরাত চারুকে খুশী রাখার চেষ্টা করছে তুলি। চারুর কী পছন্দ। চারু কী খেতে ভালোবাসে। কতোটুকু আদর পেলে চারু সুখী হয়। কতোক্ষণ জড়িয়ে রাখলে চারুর ঘুম পায়। প্রতিদিন সব রকমের চেষ্টাই করছে তুলি। তারপরও একটা প্রশ্ন থাকে তুলির মনে, চারু কী আমাকে পেয়ে সত্যি সুখী? আমি কি ওর সমস্ত অভাব পূরণ করতে পারছি?

একই অবস্থা চারুর। তুলি কি চায়? তুলি কী পছন্দ করে। অফিস থেকে একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরলে কী তুলি খুশী হয়? যে রঙের শাড়ি পছন্দ করে সেই রঙের শাড়ি এনে দেয়। কপালে যে টিপ পরলে খুব মানায় তুলিকে, খোঁজাখুঁজি করে সেই টিপ যোগাড় করে। চিকন চিকন সোনার চুড়ি পছন্দ। চারু সেই চুড়ি এনেছে ঢাকা থেকে। মাঝে মাঝে বেড়াতে চায় তুলি। এই মফস্বল টাউনে তুলিকে নিয়ে বেড়াতেও যায়। তুলির কোনো ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখে না চারু। চাকরি করতো। টাকা-পয়সার সীমাবদ্ধতা আছে। দু'দিন আগে আর পরে, তুলির সব ইচ্ছাই পূরণ করে। তারপরও কেন মনে হয় চারুর। তার সংসারে এসে তুলি কি সুখী?

দু'জনেই দু'জনকে সুখী রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তুলির একটু শরীর খারাপ হলেই অফিস থেকে ছুটি নেয় চারু। দিনরাত তুলির পাশেই থাকে। সামান্য অসুখেই বড় ডাক্তার ডাকে। নিজের হাতে ওষুধ-পথ্যি খাওয়ায়। হয়তো একটু জ্বর হয়েছে। সর্দি কাশি। তাতেই খুব অস্থির থাকে চারু।

তুলিও সেই রকম। চারুর চোখের নীচে একটু কালি জমলেই চমকে উঠে। একশ'বার চারুকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার কী হয়েছে আমাকে বলো। হয়তো পর পর কয়েকদিন রাত জেগে কাজ করার জন্য এমন হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই রাত জাগতে নিষেধ করে তুলি। রাত জাগাতে শরীর কষে গেছে। এখন শুধু ঠান্ডা খেতে হবে একটানা। কচি কচি ডাব আনায় ফাটুকে দিয়ে। বরফ দিয়ে দইয়ের শরবত খাওয়ায়। রিকশা আনে, চারুকে নিয়ে এক্ষুণি ডাক্তারের কাছে যাবে। চারু হাজার মানা করলেও তুলি তা শুনবে না। যাবেই ডাক্তারের কাছে।

মাঝে মাঝে ঢাকায় যেতে হয় চারুকে। অফিসের কাজে দু’তিনদিন দেরিও হয় আসতে। এ ক’টা দিন বিষণ্ন হয়ে পড়ে থাকে তুলি। রান্নাবান্নাও সে-রকম হয় না। কোনোদিন বিকেলেই মেন্দী মেয়েটা চলে যায়। সকালে বাজার করতে চাইলে ধমক খায় ফাটু। বাড়িতে সাহেব নেই বাজার করে কী হবে। ফাটু আর কিছু বলার সাহস পায় না, চলে যায় স্টেশনে।

ঢাকা থেকে চারু যখন বাড়ি ফিরে। তুলিকে দেখেই চমকে উঠে, একি? তোমার চেহারার এ রকম দশা কেন? আমার চিন্তায় নিশ্চয়ই ঘুম হয়নি রাতে। খাওয়া-দাওয়াও ঠিক মতো করোনি। তুমিই বলো চাকরিটা কী ছেড়ে দেবো? চাকরি করলে তো হেড অফিসে যেতেই হবে। তাই বলে তুমি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেবে? আমি তো হারিয়ে যাবো না। যদি মরণও আসে, তাকেও বলবো দাঁড়াও। আমাকে একটু সময় দাও। আমার তুলির সঙ্গে দেখা করতে হবে। এসব কথা শোনে অবশ্য হেসে উঠে। খুশী হয়। কয়েকদিনের দুশ্চিন্তা হালকা হয়ে যায় নিমিষেই। তারপরই ছোটাছুটি শুরু হয় তুলির। পরিষ্কার টাওয়ালটা এনে দেয় চারুর হাতে। গরম জল লাগবে কিনা জিজ্ঞাসা করে।

চারু খুব ক্লান্ত। রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আজ আর বেশী দেরি করলো না। তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়লো দু’জন। তার মানে এই নয়, এক্ষুণি ওরা ঘুমিয়ে পড়বে। কথার পিঠে কথা বলবে তুলি। একটা দিন ঢাকায় কেমন কেটেছে। যে হোটেলে ছিল, হোটেলটা ভালো ছিল কি? কোথায় কখন কী খেয়েছে। রাতে কী ভালো ঘুম হয়েছে। ঢাকা শহর দেখে দেখে তুলির কথা মনে ছিল কিনা। তুলিকে ছাড়াই সিনেমা দেখেছে কেন? এ রকম শত শত প্রশ্ন। কোনটার কী উত্তর দেবে, এই নিয়ে ভীষণ সমস্যায় পড়ে যাবে চারু। উত্তর শুনে তুলি খিলখিল করে হেসে উঠবে কখনও। আবার চুপচাপ থাকবে অনেকক্ষণ। চারুর তখন বুঝতে হবে অভিমান করেছে। সেই অভিমান ভাঙাতে একটু সময় লাগবে চারুর। তারপর আবার দু’জন এক সঙ্গে হেসে উঠবে। এভাবেই কথাবার্তা মান-অভিমান করতে করতেই রাত বেড়ে যাবে। গভীর হবে।

তুলির একটা অভ্যেস, রাতের যতো কথা সব আলো নিভিয়ে শুনতে হবে। আলো থাকলেই মনে হয় একজন সাক্ষী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সব কথা শুনছে। রাতের কথা ঘরভরা আলোতে শুনলে মজা পাওয়া যায় না। অন্ধকারে কথায় কথায় চারুকে চিমটি কাটতে পারে। ঠোঁট জোড়া মুচড়ানো যায়। চুল ধরে টানাটানি করলেও কেউ তা দেখতে পায় না। অন্ধকারে ফিসফিস করে কথা বলার মজাই আলাদা।

হঠাৎ একদিন দুঃসংবাদ পেলো, তুলির মায়ের অবস্থা খুবই খারাপ। আশঙ্কাজনক। বাঁচে কিনা সন্দেহ। তুলিকে তো যেতেই হবে। কিন্তু এই অবস্থায় তো একলা ছাড়া যাবে না তুলিকে। অফিসে খুব ঝামেলা চলছে। তবু যেতে হবে, এই ভেবে যখন যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে চারু, কী যেন ভেবে বাধা দিলো তুলি।

–ঢাকা থেকে বড় অফিসার আসবেন, এই সময় স্টেশন ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না। ঠিক আছে, আমি আগে যাই। গিয়ে দেখি মা’র অবস্থা কেমন। শেষ অবস্থা হলে অবশ্যই তোমাকে টেলিগ্রাম করবো। তখন তুমি যেও।

এ কথার পর আর কোনো কথা বলার থাকে না। রাত তিনটার ট্রেনেই তুলিকে তুলে দিলো চারু। যাবার বেলায় তুলি কেঁদে ফেলেছিলো। তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো চারু। ট্রেনটা ছেড়ে দেয়ার পর, চারুর চোখেও পানি টলমল করে কাঁপছিলো। চারু তা সংগোপনে মুছতে লাগলো রুমাল দিয়ে।

কোনোভাবেই কাজে মনযোগ দিতে পারছে না চারু। তুলির কথা ভাবতে ভাবতেই দিন চলে যাচ্ছে। রাত আসে ভয়াবহ অন্ধকার নিয়ে। কিছুতেই ঘুমুতে পারে না চারু। কখন কী সংবাদ আসে, এই দুশ্চিন্তায় সারারাত ছটফট করে। মায়ের অবস্থা দেখে তুলি কী খুব কাঁদছে? তুলিকে সান্ত্বনা দেবার মতো আশপাশে কেউ থাকবে না? এসব চিন্তা করে করেই মনটা আরও বেশী খারাপ হয়ে যায়। দু’তিনদিন অপেক্ষা করার পরও যখন কোনো খবর পেলো না চারু। সন্দেহ হলো, মা আর বোধ হয় বেঁচে নেই। আর দেরি করতে পারলো না চারু। কোনো রকমে ফাটু আর মেন্দী মেয়েটার কাছে সংসারটা বুঝিয়ে দিয়ে, সেই রাত তিনটের ট্রেনেই চারু রওনা দিলো। ট্রেনের স্পীড দেখেই বুঝতে পারলো, এদিকের রেললাইনগুলো খুব নড়বড়ে। যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে

যেতে পারে। সেই বৃটিশ আমলের রেললাইন আর কতো কাল সার্ভিস দেবে? এখানে ট্রেনগুলো সব আস্তে আস্তে চলে। মাটি সরে যেতে যেতে অনেক নীচে নেমে গেছে লাইন। বর্ষায় ডুবে যায়। রেল চলাচল তখন বন্ধ থাকে।

কেবল ফর্সা হচ্ছে চতুর্দিক, এরকম ভোর বেলায় তুলিদের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো চারু। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ! কোথাও কোনো শব্দ নেই। তুলি এখন কোন ঘরে আছে, তাও ঠিক বুঝতে পারছে না চারু।

বাড়িটা এতো শোকাচ্ছন্ন লাগছে কেন? সত্যিই কী তাহলে, মন বলে, না না এটা তোমার সন্দেহ। গ্রামের বাড়ি-ঘর, এরকম ভোর বেলায় নীরবই থাকে। স্টেশনের হৈচৈ-এর ভেতরে থাকতে থাকতে তুমি সব ভুলে গেছো। চারু ভাবে, ভুলবো কেন? রোগীর ঘরে সারারাতই লোক থাকে। আলো জ্বলে। রোগীর শব্দ করুণ কণ্ঠের শব্দ পাওয়া যায়। আবার সেই একই প্রশ্ন, এই বাড়ি এতো স্তব্ধ কেন?

আরেকটু ফর্সা হলো চতুর্দিক। কোথায় যেন একটা কাক ডাকছে। হয়তো এখন দু'চারটে পাখিও উড়ে আসবে। ডালে ডালে কিচিরমিচির শুরু করবে। কিন্তু এভাবে আর কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়? তুলিকে ডাকতে লাগলো চারু,

–তুলি, তুলি, তুলি।

উত্তর দিকে দরোজা খোলার শব্দ পেয়ে সেদিকেই মুখ ফেরালো চারু। অবিন্যস্ত কাপড়-চোপড় নিয়েই তুলি ছুটে এলো চারুর কাছে,

–তুমি?

–এতো আশ্চর্য হচ্ছো কেন? আমিই তো। কথা ছিল দু'দিনের মধ্যেই তুমি টেলিগ্রাম করবে?

–ঘরে চলো। ঘরে গিয়ে কথা বলবে।

যেতে যেতে চারু জিজ্ঞাসা করলো,

–মা এখন কেমন আছে।

তার কোনো উত্তরই দিলো না তুলি। ঘরের ভেতরে গিয়েই আবার দরোজা দিয়ে দিলো।

অন্ধকার। ঝুঁঝকো অন্ধকার ঘরের ভেতরে। বিছানা দেখে মনে হলো, তুলি এ ঘরেই থাকে। মা বোধ হয় অন্য ঘরে। তুলি বললো,

–এই গ্রামের কেউ তোমাকে দেখেছে?

–এই কথা বলছো কেন? এতো ভোরে কে দেখবে? আর দেখলেই বা কি! কেন?

গ্রামে কিছু হয়েছে। দিনকাল তো খারাপ। খুনটুন তো প্রতিদিনই হচ্ছে।

–না না, সে-সব কিছু না। আমি ভাবছিলাম, অন্ধকারে আমাদের বাড়ি চিনতে তোমার অসুবিধা হয়েছে। কেউ হয়তো দেখিয়ে দিয়েছে তোমাকে।

–হ্যাঁ, একবারই তো এসেছি। বাড়ি চিনতে অসুবিধাই হচ্ছিলো। অই তালগাছটা দেখে দেখে সুনিশ্চিত হয়েছি, এটা তোমাদের বাড়ি!

–এখন কী খাবে বলো, চা তৈরী করবো!

–তুমি একটা আশ্চর্য মেয়ে। খাওয়া-দাওয়া পরে, মা কেমন আছে, সে কথা বলছো না কেন? চলো, আগে মা'র ওখানে যাই।

–মা ভালো আছে। এখন ঘুমুচ্ছে। তুমি একটু শুয়ে পড়োতো, রেস্ট নাও। কাপড়-চোপড় খুলো?

এখনও তুলির সামনে কাপড়-চোপড় খুলতে লজ্জা পায় চারু। তুলি তা জানে বলেই দরোজা খুলে বাইরে এলো। চারু কাপড় বদল করে শুয়ে পড়লো তুলির বিছানাতেই। স্টেশন থেকে বেশ হেঁটে আসতে হয় গ্রামের ভেতর দিয়ে। তারপর পাওয়া যায় তুলিদের গ্রাম। হাঁটতে হাঁটতে পা দুটোতে যেন রক্ত জমে গেছে। ব্যথায় টন-টন করছে। ক্লান্তিতে ঘুম পাচ্ছে খুব।

চারুকে দেখা মাত্রই তুলির মনে জটিলতা শুরু হয়েছে। তার সমস্ত উচ্ছল সরলতা যেন জমাট বেঁধে গেছে। তুলি কখনও চায় না, চারু তাদের গ্রামে আসুক। মায়ের দুঃসংবাদ পেয়ে, মনে মনে অনেক কৌশল করে চারুকে রেখে এসেছে। সেই চারুই আজ তাদের বাড়িতে চলে এসেছে।

তুলির মনে একটাই ভয়, এই গ্রামের কেউ যদি শেলুর ঘটনাটা বলে দেয় চারুকে। তখন কি হবে? তার এই ভালোবাসার সংসারটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এ জীবনে চারু আর তাকে ভালোবাসতে পারবে না। মনে মনে ঘৃণা করবে। আর কখনোই বিশ্বাস করবে না তুলিকে। মনে মনে যদি ভেবে নেয় তুলি দ্বিচারিণী। নষ্টা ভ্রষ্টা। তখন তো কিছু বলার থাকবে না তুলির। মাথা নীচু করে চলে আসতে হবে ওই সংসার থেকে।

এই জন্যই তুলি বারবার সে রাতের সব কথা বলতে চেয়েছিলো চারুকে। চারুই শুনতে চাইলো না। সে সব কথা বলতে গেলেই রেগে যেতো। সেদিন যদি সব শুনতো চারু, ঘটনাটা আজ এতো জটিল হতো না। ভয়ে ভয়ে তুলির ভেতরটা কাঁপছে। কী করবে, না করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না।

ভোর হয়ে গেছে। ভাঙা ভাঙা টুকরো টুকরো হলুদ কাচের মতো রোদ পড়েছে বিভিন্ন জায়গায়। পাখিরা কিচির-মিচির করছে ডালে ডালে। সারা বাড়ির মানুষ জেগে উঠেছে। হাত মুখ ধুচ্ছে। মসজিদে নামাজ পড়ে ফিরে এসেছে বাবা। এখনও কেউ জানে না চারু এসেছে। তুলিই বলেনি কাউকে। একবার গিয়ে দেখে এসেছে তুলি, চারু গভীর ঘুমে অচেতন।

মায়ের অবস্থা সত্যি খুব খারাপ। অসুখটা যে কি, এখানকার ডাক্তাররা তা বলতে পারছে না। হাত-পায়ে শক্তি নেই। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারে না। পেচ্ছাব পায়খানা বিছানাতেই। হুঁশ নেই। কাউকেই ভালোভাবে চিনতে পারে না। তুলির ধারণা, বাঁচার কোনো আশা নেই। বয়সের জড়াব্যধিতে খেয়ে ফেলেছে শরীর। চলেই যাবে। যাওয়ার আগে বেশ কষ্ট পাচ্ছে।

ভোর বেলাতেই বাবার সঙ্গে কি কি যেন ফিসফাস করে আলাপ আলোচনা করলো তুলি। কোনো কিছুই বোঝা গেলো না। সবাই শুধু জানলো, জামাই এসেছে তুলিকে নিতে। তুলি আজ দশটার ট্রেনেই চলে যাবে। কে যেন খুব দুঃখ করে বললো,

–নিজের মাকে এই অবস্থায় রেখে যাবে?

বাবা তার উত্তর দিলো,

–ওরও তো সংসার আছে। জামাইয়ের অফিসে খুব ঝামেলা চলতাছে। খবর দিলে আবার চইলা আসবো। ওর মাও যে কয়টা দিন আছে। এইভাবেই সব যাওয়া-আসার মধ্যে থাকবে, আর কীইবা করা যাবে। নিজের সংসার রাইখা কে কদ্দিন থাকতে পারবো!

নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তুলি যেন পাষাণ হয়ে গেছে। মাকে এ অবস্থায় রেখে নিজের কাপড়-চোপড় গোছাচ্ছে। চারুকে ধাক্কা দিয়ে বললো,

–উঠো, এই দশটার ট্রেনেই আমরা চলে যাবো।

গায় ঘুম থেকে চমকে উঠে চারু যেন বোকা হয়ে গেলো,

–কি, কি বললে, এই দশটার ট্রেনেই চলে যাবো?

আট

মেয়েরা সব পারে। কিন্তু কখন কি করবে আগে থেকে তা বোঝা যায় না। যেমন তাদের সহ্যগুণ, তেমনি আবার যে কোনো মুহূর্তে অসহ্য হয়ে ভেঙে-চুরে তছনছ করতে পারে সব কিছু। আহা কী মায়াময় মেয়েটি। পর মুহূর্তেই তার নিষ্ঠুরতা দেখে হতবাক হয়ে যেতে হয়। তাদের সহজ সরলতা দেখতে দেখতেই অগ্নিরূপ সংহার মূর্তিও দেখা যায় ধৈর্য থাকলে। তারা খুব রহস্যময়ী। লাজ-লজ্জা দিয়ে ঢেকে রাখে সব। সুগন্ধী ফুলের ভেতর যেমন কীট থাকে। লেখকরা যাকে বলে পুষ্প কীট। মেয়েদের ভেতরের কীটগুলোও তেমনি রূপ যৌবনের আড়ালে লুকানো থাকে। কেউ কখনও বুঝতে পারে না।

মেয়েদের নিয়ে এতো গবেষণা করার সময় কোনদিনই ছিল না চারুর। কী ছোট কী বড়, মায়ের জাত বলে সবাইকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখার চেষ্টা করতো। কিন্তু সেদিন যে দুর্ব্যবহার করলো তুলি। তারপর থেকেই এসব নিয়ে ভাবছে! নারী চরিত্র কী জটিল। কী দারুণ রহস্যময়। হাসতে হাসতে কাঁদতে পারে। কাঁদতে কাঁদতেই আবার হেসে উঠে। খুব কাছের মানুষ বলে যখন ভাবছি, সে তখন দূরে চলে যায়। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে বলতেই হঠাৎ করে তাদের ভাষাও বীভৎস হয়ে যেতে পারে।

শুধু তুলি কেন, চারুও তুলির মাকে মা বলেই ডাকে। মায়ের মতই আদর-যত্ন করে। তার সুবিধা অসুবিধার খবর রাখে নিয়মিত। সেই মায়ের যখন সংবাদ পেলো ভীষণ অসুস্থ, বাঁচে কিনা সন্দেহ। পারে তো তুলির সঙ্গেই চলে যায় চারু। অফিসে খুব ঝামেলা হচ্ছে। হেড অফিস থেকে বড় অফিসাররা এসেছেন। তবু যেতে চেয়েছিলো চারু কিন্তু তুলি বলেছিল, আমি আগে যাই। তুমি এদিকে সব সামলাও। দু'দিনের মধ্যেই খবর পাবে মা'র অবস্থা কেমন। খারাপ সংবাদ পেলে তুমিও চলে এসো।

দু'দিন অপেক্ষা করেও কোনো খবরাখবর না পেয়ে চারু বাধ্য হয়েছে চলে যেতে। চারুর মন বলছিলো, উনি বোধহয় আর বেঁচে নেই। কালচে ভোর বেলায়, তুলিদের গ্রামের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়েও চারু ভাবছিলো। শোকাচ্ছন্ন বাড়ির মতোই সব এতো নীরব কেন? সব কী শেষ হয়ে গেছে?

তুলি তাকে দেখে প্রথমেই চমকে উঠলো। তারপর নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে রেস্ট নিতে বললো। বললো না মায়ের খুব খারাপ অবস্থা। বিছানাতেই পেচ্ছাব পায়খানা। হাত পা অবশ। অনড়! খুব কাছে গেলেও কাউকে চিনতে পারে না। সারাক্ষণ শরীর থেকে একটা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে।

এ রকম অবস্থায় মানুষ আগে রোগী দেখে। দেখবে না কেন? তাকে দেখার জন্যই তো ছুটে আসা। কিন্তু তুলির কাছে এসব জরুরী মনে হলো না। যেন সব কিছুই পাশ কাটিয়ে তুলি বলেছিল, তুমি রেস্ট নাও, আমি তোমার চায়ের ব্যবস্থা করছি। সঙ্গে সঙ্গেই চারু বলতে চেয়েছিলো, আমি কি এতোদূরে চা খেতে এসেছি। বাড়িতে আইঢাই প্রাণের রোগী আছে বলে এসব কথা বললো না। তুলি কি মা-বাবার বাড়িতে এসেই বদলে গেলো? না ওর মা'র অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক বলে মনের অবস্থা খুবই খারাপ! তাই বলে আমার সঙ্গে এ রকম রসকষহীন কথা বলবে কেন। বরং মনের সব দুঃখতো এখন আমার কাছেই প্রকাশ করবে? কী জানি, দু'দিনেই তুলিকে অন্যরকম লাগছে। ট্রেন জার্নি করেছে। শরীরটা ক্লান্ত। এসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লো চারু।

তুলির ধমকেই ঘুম থেকে চমকে উঠলো চারু। তার সঙ্গে সঙ্গেই তুলির কাছ থেকে শুনতে হলো, এখখুনি, এই দশটার ট্রেনেই আমরা চলে যাবো।

–চলে যাবো, আমি তাহলে আসলাম কেন? মাকে দেখবো না?

সুটকেসটা গোছাতে গোছাতে তুলি বললো,

–বাঁচবে না। চলো

–কোথায়?

–মার ঘরে

দু'জনেই মা'র কাছে গেলো। মাকে আবার খুব আদর করে ডাকছে,

–মা, মা, চারু এসেছে তোমাকে দেখতে। চোখ খুলো। মা মা–

মা খুব আস্তে আস্তে চোখ দুটো খুললো; কিন্তু চোখের মনি দুটো স্থির। বোধহয় নড়াতে পারছে না।

চারু ডাকতে ডাকতে আরও কাছে গেলো,

–মা, মা, মা আমি চারু, আমাকে দেখতে পাচ্ছেন? মা–

বোধহয় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। হাত দিয়ে যে ইশারা দেবে, সে হাতও নাড়াতে পারছে না। নিঃশ্বাসটা শুধু ধীরে ধীরে যাওয়া-আসা করছে। শরীরটা অবশ হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। এটাই বোধহয় মানুষের শেষ অবস্থা। ঠিক এই মুহূর্তেই তুলি বললো,

–সময় নেই। তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে স্টেশনে চলো।

–মাকে এ অবস্থায় রেখে যাবে?

–বাড়িতে তো সবাই আছে, আমি আমার সংসার ফেলে আর কতোদিন থাকবো। চলো।

এই তুলিকে চিনতে পারছে না চারু। মায়া-মমতা বলে কিছু নেই তার ভেতরে। সে যে এতো যাবো যাবো করছে। সংসার বলতে তো সে আর আমি। আমার এই ছোট্ট সংসারে কী আছে? তুলির এই পাষাণ রূপ কখনও কল্পনাও করতে পারেনি চারু।

মৃত্যু পথযাত্রী মাকে ফেলে রেখে মেয়ে চলে গেছে, এমন কোনো কথা জীবনে শোনেনি। তবু একবার অনুরোধ করলো চারু।

–তুমি এই শেষ ক'টা দিন পাশেই থাকো। আমি দু'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি। ছুটি শেষ হলেই আমাকে চলে যেতে হবে।

–এখানে থাকলে কী মাকে বাঁচাতে পারবে?

এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। আর কোনো কথা বলার চেষ্টা করলো না চারু!

শুধু বললো,

–যেতে হলে এক্ষুণি যেতে হবে। খাওয়া দাওয়া করার সময় নেই।

বিয়ের পর এই প্রথমবার শ্বশুর বাড়িতে এসেছিলো চারু। তাও আবার না খেয়েই চলে যেতে হলো। এইভাবে তুলি চলে যাওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে কী ঝগড়া হয়েছে তুলির? কিন্তু তাদের কথাবার্তায় তো সে রকম কিছু মনে হলো না। এই বাড়িতে চারুকে কখনও একলা ছাড়েনি তুলি। যতোটুকু সময় ছিল, যার সঙ্গেই কথা বলেছে, সব সময় তুলি তার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতো। এমনকি বাবার সঙ্গে যখন কথা বলে চারু, তখন বাবাকেই ধমক দিয়েছিল তুলি,

–তোমরা বেশী কথা বলো। কম কথা বলা তোমাদের রক্তে নেই।

ট্রেন যাচ্ছে। জানালায় মুখ রেখে বাইরের দৃশ্যগুলো দেখছে চারু। সবুজ ধানের প্রান্তর। ছোট ছোট গ্রাম। হাট বাজার। আঁকাবাঁকা নদী। ঝাঁক-ঝাঁক পাখি। নদীর ধারে সাদা সাদা কাশবন। বর্ষার সেই থৈ থৈ জল নেই কোথাও। প্রচণ্ড রোদের টানে সব শুকিয়ে গেছে। খোলা আকাশ। নীল আকাশের মাঝে মাঝে সাদা মেঘ। তারপরও এসব কিচ্ছু ভালো লাগছে না চারুর। মাকে মৃত্যুর হাতে রেখে কোনো মেয়ে চলে আসতে পারে স্বামীর সঙ্গে, এমন নির্মম দৃশ্য জীবনে এই প্রথম দেখলো চারু।

তুলি তার পাশেই বসে আছে গোমরা মুখে। এ পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি চারুর সঙ্গে। মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। চারু আর পারলো না। অসহ্য হয়েই তুলিকে বললো,

–তুমি খুব নিষ্ঠুর!

তুলি যেন স্বীকার করে নিয়ে উত্তর দিলো!

–ভালো!

চারু মনে মনে খুব রেগে যাচ্ছে তুলির উপর। ভেতরে ভেতরে একটা রাগ তো ছিলই। এবার একটু উত্তপ্ত মেজাজেই বললো,

–আমি অসুস্থ হলে, এ রকমভাবে একদিন আমাকে ফেলেও চলে যাবে।

এ কথার কোনো উত্তর দিলো না তুলি। তাতে রাগটা আরও বেড়ে গেলো চারুর। আপন মনেই বলতে লাগলো। নিশ্চয়ই কোনো ঘটনা আছে। তা নইলে হঠাৎ এভাবে চলে আসবে কেন! চারু বললো,

–অবশ্যই কিছু ঘটেছে, যা তুমি আমাকে বলছো না। বলো, কী হয়েছে!

–কিচ্ছু হয়নি!

–হয়েছে।

–কি হবে? আমি তোমার জন্যেই চলে এলাম। সরকারী চাকরি। ছুটি না নিয়ে কী বেশী দিন থাকা যায়?

–চাকরিটা আমার। কতোটা অন্যায় করলে চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে, এ বিষয়টা আমার জানা আছে। তুমি যা বলছো, মিথ্যে কথা বলছো! এই গ্রামে কী তোমার কোনো দুর্নাম আছে? যা আমি জানতে পারলে তোমার অসুবিধা?

বেশ চড়া গলায় তুলি বললো,

–কি বলতে চাও তুমি?

–বিয়ের আগে নিশ্চয়ই তোমার কোনো দুর্নাম ছিল। আমি দু’চারদিন তোমাদের গ্রামে থাকলেই, কেউ না কেউ আমাকে বলে দেবে সব। এই ভয়েই তুমি আমাকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে চলে এলে। আমি তোমাদের বাড়িতে যতোটুকু সময় ছিলাম, যার সঙ্গেই কথা বলেছি, তুমি আমার পাশেই দারোগা পুলিশের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে। কেন? সব সময় তোমার মনে একটা ভয় ছিলো, অস্বীকার করতে পারো?

কেঁদে ফেললো তুলি। একটু শব্দ করেই কাঁদলো। কান্না জড়ানো কণ্ঠেই বললো,

–না জেনে-শুনে তুমিই যদি আমাকে দুর্নাম দাও। বিষ খেয়ে মরে যাওয়া ছাড়া, আমার আর বেঁচে থাকার কোনো উপায় থাকবে না।

অসহায়ের মতো কাঁদতে লাগলো তুলি। এই কান্না দেখে আবার খারাপও লাগছে চারুর। মনে হচ্ছে, এ ধরনের কথা বলা উচিত হয়নি। কথাগুলো খুব বাজে কথা। তার মুখ থেকে এসব কথা তুলি কখনও আশা করতে পারে না। আবার চারুর সন্দেহ প্রবণ মন প্রশ্ন করলো, তুলির এই কান্নাটাও কী মিথ্যে কান্না! নাকি সত্যি সত্যিই কাঁদছে তুলি।

অনেকক্ষণ অঝোরে কাঁদতে দেখে চারু নিশ্চিত হলো, সত্যিই সে কাঁদছে। কিন্তু কোনো কথা বললো না। আমার এই ছোট্ট সংসারের জন্য ওর এতো মায়া? অন্তিম শয্যায় শায়িত অবশ মাকে ফেলে চলে এলো? এও কী কখনো হয়? চারুর সব চিন্তা-ভাবনা এখানে এসেই থেমে যায়। নির্মম নিষ্ঠুর ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না তুলিকে।

ক'দিন যাবত কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। একই বিছানায় একই ছাদের নীচে ঘুমায় ঠিকই কিন্তু ওপাশ ফিরে ঘুমায়। কেউ কারোর দিকে তাকায় না। ডাকাডাকি নেই। যে যার মতো ঘুম থেকে উঠে। তুলির ঘুম ভাঙে ভোর বেলায়। আর চারু ঘুম থেকে উঠে সাড়ে আটটা ন'টার দিকে। চারু যা খায়, যা খেতে পছন্দ করে। সবই তৈরী করে রাখে তুলি। এখানে তুলির কোনো ভুল হয় না। কথা না বলেই দিনরাত চারুর সেবা করে যাচ্ছে। চারু মাঝে মাঝে ভাবে, দোষ তো আমার। আমারই প্রথম কথা বলা উচিত। কিন্তু মন বলে, কেন? কেন তুমি কথা বলবে? তুলি তোমার স্ত্রী। জীবন সঙ্গিনী। তার এতো জেদ থাকবে কেন? স্ত্রীই তো স্বামীর মান ভাঙায়। অপেক্ষা করো, সে বাধ্য হবে তোমার সঙ্গে কথা বলতে। চারুও তার খোঁজ খবর নেয়। ফাটুকেই জিজ্ঞাসা করে খাবার-টাবার খেয়েছে কিনা। ফাটু বলে দেয় সব। নিজের চোখে অনেক সময় দেখতে পারে না। ফাটু মেন্দীর কাছ থেকে ফুসফাস করে জেনে নেয়।

গভীর রাতেই তুলি বালিশে মুখ লুকিয়ে নীরবে নীরবে কাঁদে। কান্নার বেগ যখন বেরোয় তখন কিছু শব্দ হয়। সেই শব্দে ঘুম ভেঙে যায় চারুর। কাঁদছে কেন? এই কথা না বলার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না বলেই কী কাঁদছে? না না, সে কান্না এরকম নয়। তুলি যে তার মায়ের জন্য কাঁদছে। বার বার অই অনড় অবশ মায়ের কথা মনে পড়ছে। ওর কান্নার ধরন দেখেই তা বুঝতে পারছে চারু। কিন্তু কোনো সান্ত্বনা দিচ্ছে না। চারুর মনে ওই প্রশ্নটাই ঘুরে ঘুরে পাক খায়। মৃত্যুর হাতে মাকে রেখে তুলি চলে এলো কেন?

ভোর বেলা থেকে একটা কাক একটানা কা কা করছে। চারুর ঘুম ভেঙে যাবে বলে তুলি কয়েকবারই ঢিল মেরেছে কাকটাকে। ঢিল খেয়ে উড়ে যায় ঠিকই আবার কিছুক্ষণ পর এসে একই ডালে বসে কা কা করতে থাকে। তুলি খুব উদাস কণ্ঠে বলে,

–কাকটা এ রকম কেন?

এইবার মেন্দী ছুটে এসে কাক তাড়ায়। কিন্তু যায় না। বাড়ির আশেপাশেই থাকে। কিছুক্ষণ পর আবার উড়ে এসে বসে। কা কা করে। তুলি মেন্দীকে বলে,

–কাকটার খুব ক্ষুধা লেগেছে বোধ হয়। কিছু খেতে দে।

মেন্দী কাকের সামনে ভাত ছিটায়। কী আশ্চর্য, কাকটা ভাতের দিকে তাকায়। দেখে অথচ খায় না। আবারও কা কা করতে থাকে।

অনবরত এই কর্কশ ডাকে ঘুম ভেঙে যায় চারুর। বিছানায় উঠে বসে। কিছুক্ষণ ঝিম ধরে থাকে। তখনও কাকটা কা কা করেই যাচ্ছে। চারু যখন বাইরে এসে দাঁড়ালো। চারুকে দেখা মাত্রই কাকটা উড়ে গেলো। কার কাছ থেকে চারু শুনেছিল, এখন আর কিছুতেই তার নামটা মনে করতে পারছে না। সে বলেছিল, কাকের ডাক খুব অশুভ। সকাল বেলাতেই মনটা খারাপ হয়ে গেলো চারুর। কাকের ডাকে ঘুম ভাঙলো, আজকের দিনটা বোধহয় ভালো যাবে না। অফিসে গিয়েই শুনলো, সহকারী স্টেশন মাস্টার সাহেবের অবস্থা খুব খারাপ। ভীষণ জ্বর। জ্বরের তাপ কিছুতেই কমছে না। ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী মাথায় পানি ঢালছে বারবার। কাকটা আবার এই বাড়িতে এসেছে। চুপ করে বসে ডালে। তার মুখে আর কা কা শব্দটা নেই। রান্নাঘর থেকেই দেখা যাচ্ছে কাকটাকে। মেন্দী কাকটার দিকেই তাকিয়ে বলছে,

–দ্যাহেন, কাকটা আবার আইছে। এই রহম কাক আমি জীবনে দেহি নাই, পচা-ধচা যা পায়, কাক সবই খায়। আর এই কাকটা, আমি ভাত ছড়াইয়া দিলাম, ভাত খাইলো না।

কাঁচা তরকারী কুটছিলো তুলি। মেন্দীর কথা শুনে হঠাৎ তার হাতের কাজ থেমে গেলো।

তুলি খুব বিষণ্ন গলায় বললো,

–খাবে কী, খাওয়াতো শেষ!

মেন্দী বুঝতে পারলো না কাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বললো। মনে হলো, নিজেই নিজেকে যেন বললো আপন মনে।

ক'দিন যাবতই বেগম সাহেবার মন খুব খারাপ। খাওয়া দাওয়া যা করে তাও পাখির মতই। এক-আধটু খায়। তাও অসময় অবেলায়। গোসল করারও সময় নেই। আগে যেমন ঘড়ি ধরে সময়মতো সব কাজ করতো। এখন আর সময় টময় নেই। ইচ্ছা হলো খেলো, ইচ্ছা হলো না, খেলো না। সকালের গোসল করে সেই বিকেলে। সূর্য ডোবার আগে আগে। কথাও বলে খুব কম। প্রয়োজন না হলে কথাই বলে না। আমার মা আর বাঁচবে না, এই বলে মেন্দীর সামনেই সেদিন খুব কেঁদেছে। মেন্দীকেই বলেছে, মাকে যে অবস্থায় রেখে এসেছে পৃথিবীর কোনো মেয়ে এই অবস্থায় আসতে পারে না।

রাত আটটা বাজে, এখনও বাড়ি ফিরেনি চারু। সন্ধ্যা ছ'টার দিকে সহকারী স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারে গিয়েছিলো। তার অবস্থা ভালো না। জ্বর একশ' চার। কিচ্ছুতেই নামছে না। ডাক্তার সাহেব বলেছেন, আমি যা ওষুধ দিয়েছি, তাতে আজকের রাতটা দেখতে হয়। তারপরও যদি জ্বর না নামে, কাল সকালেই হাসপাতালে পাঠাতে হবে। এই অবস্থায় রোগীর সঙ্গে কথা বলা যায় না। যা কিছু বলার সব ডাক্তার সাহেব এবং তার স্ত্রীকে বলে চলে এসেছে। ফিরে এসে চারু এখন অফিসে কাজ করছে। আরও কতোক্ষণ যে কাজ করতে হবে, চারু তা নিজেও জানে না আজ।

দুপুরে খেতে আসেনি চারু। সাড়ে পাঁচটার মেলট্রেনটা চলে গেলেই সাধারণতঃ বাড়ি ফিরে। অফিসের কাজকর্ম যেদিন বেশী থাকে, সেদিন দেরি হয়। তুলি ভাবছে, আজও বোধ হয় কাজের চাপ বেশী। সেজন্যেই এখন পর্যন্ত আসছে না। মানুষটার খুব কষ্ট হচ্ছে। সেতো স্টেশনের কোনো খাবারই খায় না। খায় শুধু চা, খালি পেটে এই চা খেয়ে খেয়েই একদিন অসুখ বাধাবে। কথা না বললেও খুব উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে তুলি।

তুলির একবার মনে হলো আজ কি পূর্ণিমা? আকাশে ঝকঝকে থালার মতো চাঁদ। চারদিকেই অফুরন্ত জোছনা। আঁকাবাঁকা রেল লাইন। সবুজ ভরা তেপান্তরের মাঠ। মাঠের ওপারের ছবির মতো ছোট ছোট গ্রাম। সবখানেই আকাশ উপচে পড়েছে জোছনা। এই ভরা জোছনায়, পাগলের মতো একটা কোকিল শুধু ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে কাকে যেন ডাকছে। এই ডাকাডাকি কখনও থামছে না। অনেকক্ষণ পর, তুলির মনে হলো কোকিলটা কাউকেই ডাকছে না। কাঁদছে। একা একাই উড়ে উড়ে শুধু কাঁদছে। ডাকাডাকির ব্যাপার হলে একটু থেমে থেমে ডাকতো। জোছনার এই নির্জনতা অনুভব করতো। কিন্তু ও যেভাবে একটানা ডেকে ডেকে যাচ্ছে। ওটা ডাক নয়, দুঃখ পাওয়া এক কোকিলের কান্না!

রাত যখন দশটা বাজে, তখন তুলিই মেন্দীকে বললো,

–আজ তোর দেরি হবে মেন্দী, সাহেব না খাওয়া পর্যন্ত তুই যাবি কী করে?

মেন্দী মেয়েটার গলার স্বর খুব মিষ্টি। আস্তে বললেও স্পষ্ট শোনা যায়

–হ। আমিও তাই ভাবতাছি, আইজ কোনো অসুবিধা অইবো না, চাইর দিকেই এ ফক্ফকা জুছনা।

সংবাদটা মাস্টার সাহেবই পেলো। আজ সন্ধ্যায়, মাগরেবের নামাজের পরেই উনি ইন্তেকাল করেছেন। লাশ রেখে দেয়া হয়েছে এখনও। গরম দিন তো। সকালের পরে আর রাখা যাবে না। দাফন করতেই হবে। মাস্টার সাহেব বললেন,

–আমরা রাত তিনটার ট্রেনেই চলে যাবো।

বারবার কান্না পাচ্ছে চারুর। রুমালে চোখ মুছছে আর ভাবছে, এই সংবাদটা আমি তুলিকে কীভাবে দেবো। খুব নীরবে কোয়ার্টারে ঢুকলো চারু। ঘরে গিয়েই লাইট অফ করে দিলো। চমকে উঠলো তুলি। লাইট অফ

করলো কেন? সে কি আজ বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে? রাতে আর খাবে না? তুলি আস্তে আস্তে দরোজার কাছে এসে দাঁড়াতেই ফুঁসফাঁস শব্দের কান্না শুনতে পেলো। চারু কাঁদছে কেন? ও তো সহজেই কাঁদে না। খুব দ্রুত ঘরের ভেতর গিয়ে লাইট অন করে দেখলো মাথা নীচু করে চারু কাঁদছে। চারুর কান্না দেখে তুলিরও কান্না পেলো। সে সব ভুলে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

–তুমি কাঁদছো কেন? তুমি কাঁদছো কেন?

নিজের চোখের পানি মুছতে মুছতেই চারু বললো,

–মা নেই। আজ মাগরেবের নামাজের পর উনি ইন্তেকাল করেছেন।

–মা-মাগো।

এই চিৎকার দিয়েই কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালো তুলি। দাঁতে দাঁত লেগে গেলো। মেন্দী ছুটে এসে পানির ছিটা দিতে লাগলো মুখে। চা চামচ দিয়ে দাঁতের খিল খুলে দিলো চারু। পানির ছিটা পেয়ে জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার চিৎকার করলো,

–মা, মাগো– ওমা।

আবার জ্ঞান হারালো তুলি।

রাত তিনটার ট্রেনেই তুলিকে নিয়ে রওনা হলো চারু। তুলির কান্না থামছে না। প্রলাপের মতো বারবার ওই কথাগুলোই বলছে,

–মাগো, মা আমারে ক্ষমা করেনি, আমি তাকে মৃত্যুর হাতে রেখে চলে এসেছিলাম। মা, মাগো, আমি কেন চলে এসেছি, সে কথা শুধু মা জানতো। মা, মাগো এই বলে আর অঝোরে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে গলা ভেঙে গেছে তুলির।

ভোর হবে হবে। এমন সময় বাড়িতে ঢুকলো চারু। সারা রাত কেউ ঘুমায়নি। সবাই জেগে আছে। হ্যাজাক বাতিটা এখনও নেভায়নি। হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠলো তুলি,

–মা, মাগো–

তুলিকে সবাই জড়িয়ে ধরে একসঙ্গে কেঁদে উঠলো। বাপ ভাই ভাবী, কাছে-কুলের সব আত্মীয়-স্বজন বুক ভাঙা আর্তনাদের মতো কাঁদতে লাগলো। একজন মুরুব্বী গোছের লোক শুধু বললো,

–এইভাবে কাইন্দো না, মৃত আত্মা কষ্ট পায়। আল্লাহ্‌রে ডাকো, আল্লাহকে ডাকো।

সাদা কাফনের মতো রোদ উঠলো। বোধ হয় ছোট ছোট পাখিরাও মানুষের দুঃখ-বেদনা বুঝতে পারে। এ বাড়ির কোথাও কোনো পাখি কিচির-মিচির করলো না আজকের শোকাচ্ছন্ন সকালে। সারা বাড়ির বাতাসে তখন আগরবাতির গন্ধ। পবিত্র কোরআন শরীফের আয়াত। আর আত্মীয়-স্বজনে কান্নার ধ্বনি।

এই কান্নার আওয়াজ আরও চারগুণ বেড়ে গেলো, মায়ের লাশ নিয়ে যখন সবাই রওনা করলো গোরস্থানের দিকে। এই তার শেষ যাওয়া। কোনোদিন আর সে ফিরে আসবে না এই বাড়িতে। তুলি কাঁদছে আর ছোটাছুটি করছে মায়ের সঙ্গে সেও চলে যাবে বলে। বাড়ির সব মেয়েরা তুলিকে আটকাতে পারছে না। তুলির বুকভাঙা কান্না আর ঝাপটা-ঝাপটি করেও সবাই তাকে ধরে রেখেছে। এক সময় তাদের বুকেই মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারালো তুলি।

দুপুর গড়িয়ে পড়লো বিকেলের দিকে। সাদা কাফনের মতো রোদ হয়ে গেলো তুলির মৃত মায়ের মুখের মতো হলুদ। নিষ্প্রাণ। মাকে মাটি দিয়ে সবাই ফিরে এসেছে। শেষ বর্ষার মাটি তো, কোদাল মারলেই জল-কাদা থিক্‌থিক্ করে উঠে। সবার হাতে-পায়ে জল-কাদা শুকিয়ে আঠার মতো লেগে আছে। এখানে নদী একটু দূরে।

যে যার মতো গোসল করতে গেলো গ্রামের পুকুরে। কলতলায়। হাতে পায়ে শুকনো কাদা-মাটি নিয়ে এক জায়গায় মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে আছে চারু। বাবার মৃত্যুর পর আবার খুব আঘাত পেয়েছে এই মৃত্যুতে। কান্না চাপতে চাপতে তার বুক-গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। এ বাড়ির সবাই তো শোকাচ্ছন্ন। কার কাছে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানির কথা বলবে, শেষ পর্যন্ত বাচ্চা একটা মেয়েকে বললো,

–আমার জন্য এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি আনতে পারবে?

–হুঁ।

এই বলে মেয়েটি এক দৌড়ে ভেতর বাড়িতে গেলো। অনেক শোকে পাথর হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা চারুর। সে ভাবছে, সেদিন জেদ করে তুলি না গেলেই ভালো হতো। যে কোনো মৃত্যুই যে খুব কষ্টের, মায়ের কাছে থাকলে তুলি তা নিজের চোখেই দেখতে পারতো। সে দুঃখেই বোধহয় তুলি আরও বেশী কান্নাকাটি করছে। মেয়েদের বোঝা খুব মুশকিল, কেনই বা রাগ করে চলে যায়। আবার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে খুব বেশী ভেঙে পড়ে। এই বেশী বেশী ব্যাপারটাই বোধহয় মেয়েদের মধ্যে বেশী থাকে।

ঠিক এই সময়েই, টলটলে এক গ্লাস পানি নিয়ে তুলি এলো চারুর কাছে। আঁচলটা কামড় দিয়ে রেখেছে মুখে। এখনও কাঁদছে। তার দু'চোখ বোঝাই কান্না, খুব নীরবে ঝরছে। তৃষ্ণায় খাঁ খাঁ বুক। ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে পানিটা খেয়ে যেন প্রাণটা ফিরে পেলো চারু। শূন্য গ্লাসটা তুলির হাতে দিলো। ভেজা ভেজা এবং ফ্যাসফ্যাসে ভাঙা গলায় তুলি বললো,

–চলো।

–কোথায়?

–তোমার হাতে-পায়ে কবরের মাটি লেগে আছে। গোসল করতে হবে। ভেতরে চলো। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

আর কোনো কথা হলো না। তুলি চারুকে নিয়ে ভেতরে গেলো।

এ বাড়িতে তো চুলা জ্বলেনি। পাশের বাড়ির কেউ হয়তো খাবার ব্যবস্থা করেছে। পুরুষেরা সেই বাড়িতে গিয়েই খাচ্ছে। তুলির বাবা এসেছে চারুর কাছে। খুব শান্ত গলায় বলছে,

–তুমিও চলো বাবা, কিছু তো মুখে দিতে অইবো।

মুরুব্বী মানুষ। মুখোমুখি সরাসরি না করতে পারছে না চারু। মাথা নীচু করেই বলছে,

–আব্বা, আমি একটু পরে খাবো।

এখানেও অনেকটা ঝড়ের মতোই হাজির হলো তুলি,

–বাবা, ও গতকাল সারাদিন খেতে পারেনি কাজের চাপে। মা'র খবর পেয়েতো আর খাবারের কথা মনে ছিল না। রাত গেলো, আজ সারাদিনও কিছু পেটে পড়েনি। এখন কিছু না খেলে মানুষটা বিছানায় পড়ে যাবে বাবা। যে করেই হোক, ওকে কিছু খাওয়াও। বাবা আদর করে, চারুকে খুব কাছে নিয়ে বললো,

–চলো বাবা, চলো, কিছু খাইয়া নেও। তুমাদের বাঁইচা থাকতে অইবো তো, চলো।

বাবার সঙ্গে যেতেই হলো চারুকে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই, স্পষ্ট হলো আকাশে গোলাকার থালার মতো চাঁদ। এই শোকাচ্ছন্ন বাড়ি ভরে গেলো জোছনায়। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। বাড়ি বোঝাই মানুষ। তবু কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই চুপচাপ বসে আছে। কেউ কেউ এখনও কাঁদছে কিন্তু খুব নীরবে। আবার কেউ বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে মাঝে

মাঝেই। আস্তে আস্তে রাত গভীর হলো। বারান্দার মাটিতেই চুপ করে বসেছিল। উনার খুব কাছে গিয়ে ফিসফিস করে চারু বললো,

–বাবা, আমাকে এই রাত তিনটের ট্রেনেই যেতে হবে। আমার স্টেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টারের খুব জ্বর। কিছুতেই কমছে না। আজ রাতে না কমলে, কাল সকালেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

বাবা খুব বিষণ্ন গলায় বললো,

–যে গ্যালো, সে তো আর ফিরা আসবো না বাবা। কাজ-কর্ম করতেই অইবো, যাও।

আবার আস্তে আস্তে চারু বললো,

–বাবা, তুলি খুব ভেঙে পড়েছে। ও আরও ক'টা দিন আপনাদের সঙ্গে থাকুক এখানেই।

তুলি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে,

–না বাবা, আমাকে ওর সঙ্গেই যেতে হবে। আমি না গেলে ওর খুব অসুবিধা হবে।

চারু এবার অভিভাবকের মতো বলার চেষ্টা করলো,

–পাগলামি করো না তুলি। তিন দিনের মাথায় তো আমাকে আবার আসতেই হবে। তখন না হয় যেও। দুটো দিন তুমি থাকলেও তো বাবাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে।

তুলি আর কোনো কথা না বলে ঘরের ভেতরে চলে যায়। বাবা আর চারু স্তব্ধ হয়ে থাকে অনেকক্ষণ। চারু ভাবছে, মাকে মৃত্যুর হাতে রেখেই চলে গিয়েছিলো আমার সঙ্গে। সেই মাকে আজ কবরে রেখেই আবার চলে যেতে চাচ্ছে, এর কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছে না চারু। কেন? এমন করছে কেন তুলি?

রাত যতো বাড়ছে, রাতের জোছনা যেন ততই উপচে পড়ছে আকাশ থেকে। কিন্তু এই মরা বাড়িতে জোছনাও যেন বিষণ্নতা ছড়ায়। বাড়ির নির্জনতাকে আরও বেশী শোকাচ্ছন্ন করে তোলে।

জোছনায় প্লাবিত সবুজ তেপান্তর ভেঙে ভেঙে, গ্রাম-গঞ্জের নির্জনতা চুরমার করে যেন ছুটে চলেছে শেষ রাতের মেলট্রেন। ফার্স্ট ক্লাস কামরায় মাত্র দু'জন যাত্রী। চারু আর তুলি। চারুর পাশেই নিশ্চুপ পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে তুলি। শেষ পর্যন্ত বাবা খুব অনুনয় করে বলেছিল,

–মাগো, মাত্র দুইডা দিনই ত, তুই আমার কাছেই থাক মা। তিন দিনের মাথায় ত চারু চলেই আসবে।

তুলি তখনও জেদী মেয়ের মতো বলেছে,

–মা মরেছে আমার! মা হারানোর ব্যথা যে কী, আমি তা মর্মে-মর্মে টের পাচ্ছি! তারপরও এখখুনি কেন যেতে চাচ্ছি, কোনোদিনই আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পারবো না!

তারপর বাবা আর কোনো কথা বলেনি। চারুর মুখ থেকেও আর কোনো শব্দ বেরোয়নি এখন পর্যন্ত। কারোর সঙ্গে কোনো কথা না বলেই ট্রেনে উঠেছে তুলি। ট্রেন চলছে ঝা ঝিক ঝিক শব্দে। চারু শুধু ভাবছে, জীবনটা অনেক বড়। দীর্ঘ পথ। তুলির মতো এরকম জেদী মেয়েকে নিয়ে এতো দূরের পথ যাওয়া যাবে না। আরও কিছুক্ষণ চুপ থেকে চারু আপন মনেই বললো,

–আর পারছি না!

আপন মনে বললেও কথাটা শুনে ফেলেছে তুলি। তখখুনি একটু জোরেই তুলি বললো,

–আমিও আর পারছি না।

একবার শুধু তুলির দিকে ফিরে তাকালো চারু। তারপর আগের মতই ট্রেনের জানালায় মুখ রেখে শেষ রাতের

ফ্যাকাসে জোছনা দেখতে লাগলো। আমাকে ফেলে জোছনা দেখবে? এটা বোধহয় সহ্য হলো না তুলির। তুলি চারুকে ধারালো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,

–তুমি আমাকে সন্দেহ করো?

চারুর কোনো ঝগড়া করার ইচ্ছে নেই। সে মুখে-চোখে একটু বিরক্তি ভাব নিয়ে বললো,

–আহা এসব কথা এখন থাক না?

–থাকবে কেন? আমি তোমার চোখ দেখলেই বুঝতে পারি, তুমি আমাকে সন্দেহ করো।

–তুলি, তুমি খুব ক্লান্ত! এসব কথা পরে বলা যাবে না!

–না, তুমি আমাকে সন্দেহ করো বলেই আমার মাকে আমি মৃত্যুর হাতে রেখে চলে এসেছিলাম। আজও অই একই কারণে আমাকে চলে আসতে হলো। আমি তো তোমাকে সব কিছুই বলতে চেয়েছিলাম। তুমি কখনো সেসব শুনতে চাওনি; কেন শুনতে চাওনি? ঘরের নতুন বউ, পাঁচ দিন নিখোঁজ থাকে। এসব কথা যে শুনতে চায় না, সে কি রকম স্বামী? মণি ঋষি বাউল সন্ন্যাসী? তাহলে বিয়ে করেছিলে কেন? কোনো কথা শুনবেও না, আবার সন্দেহের চোখেও দেখবে?

ভাঙা গলায় এতো কথা এক সঙ্গে বলতেও পারে না তুলি। এবার হু হু করে কাঁদতে কাঁদতেই বলে,

–তোমার আমার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির একটা অদৃশ্য দেয়াল তৈরী হয়েছে। সারা জীবনেও এ দেয়াল ভাঙতে পারবো না। এভাবে সংসার করা যায় না চারু। ভালো না লাগলে বলো, আমি চলে যাবো। স্বামী-স্ত্রীর ভেতর যদি সন্দেহ থাকে, সে সংসার কোনোদিনই সুখের হয় না।

আঁচলে নিজেই নিজের মুখ চাপা দিয়ে এমনভাবে কাঁদছে তুলি, মনে হচ্ছে এ জগতে তুলির কেউ নেই। ভীষণ অসহায়ের মতো কাঁদছে তুলি।

ওর এই হৃদয় ভাঙা কান্নার শব্দে, চারুর চোখও ছলছল করে উঠলো। তুলিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, চোখের জল মুছতে মুছতে বললো,

–তুমি আমাকে এতো ভালোবাসো কেন? বলো এতো বেশী ভালোবাসো কেন?

–আমি কাউকে ভালোবাসি না, মিথ্যে কথা!

–বেশী ভালোবাসো বলেই তো ভুল বোঝাবুঝিটা বেশী হচ্ছে? একটু কম কম ভালোবেসো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর চারু যা বললো, সবই কাব্য মনে হলো তুলির কাছে। চারু বললো, পৃথিবী মানেই কখনও আলো, কখনও আঁধার। এই যে জোছনা, এই জোছনা কী সব সময় থাকে? থাকে না। মানুষের জীবনটাও এই আলো-আঁধারের মতই। কখনও সুখ, কখনও দুঃখ। ধরো, আমাদের শিউলি ফুলের গাছটায় এখন আর কোনো ফুল নেই! তুমি কি মনে করো ফুল আর ফুটবে না? অবশ্যই ফুটবে। তবে একটু সময় লাগবে, অপেক্ষা করো, ধৈর্য ধরো! এইটুকু বুঝতে পারলেই ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। মন থেকে সন্দেহটাও ছুটে পালাবে।

চারুর বুক থেকে খুব দ্রুত উঠে তুলি বলে,

–এতো মধুর মধুর কথা বাস্তব জীবনে কোনো কাজে লাগে না। জীবনটা হলো রান্নাঘরের চাল-চুলো, আগুন-পানির মতো। জীবনে আমি যা বলতে চাইবো, তুমি তা শুনবে কিনা বলো।

–শুনবো, শুনবো।

–বিদ্যা-বুদ্ধির অহঙ্কার দেখাবে না তো?

–না।

–মনে সন্দেহ হলে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, সরাসরি জিজ্ঞাসা না করলেই কিন্তু সন্দেহটা বাড়বে।

–বুঝলাম তো, এসব কথা আরও আগে বলা উচিত ছিল, আর কী বলবে?

কথা বন্ধ করে, কী একটা আলোর আভা দেখে, দু'জনেই ট্রেনের জানালার দিকে তাকালো। ভোর হয়ে গেছে। টুকটুকে রোদ পড়েছে সবুজ পাতায়। দিনটা মনে হয় ভালোই যাবে। দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকালো।